"সত্য দেয় মনের শান্তি,মিথ্যা দেয় সংশয়।
প্রতিটি ভালো কাজই একটি দান..."

সম্পাদনা
আসাদুল্লা আল গালিব | পারভেজ আহমেদ

জনতার কণ্ঠ

প্রকাশকাল : জুলাই, ২০২০

প্রচ্ছদভাবনা - পারভেজ আহমেদ

সম্পাদনা - আসাদুল্লা আল গালিব ও পারভেজ আহমেদ

বিনিময় - ৫০ টাকা মাত্র

জনতার কণ্ঠ

উপদেষ্টা মন্ডলী

আবু বাক্কার সিদ্দিকী (বিশিষ্ট আইনজীবী, সভাপতি বহরমপুর বার অ্যাসোসিয়েশন)

মাহবুব মুর্শিদ (বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী)

গিয়াসুদ্দিন দালাল (নজরুল সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদক)

ড. মৌমিতা বৈরাগী (সংগীতশিল্পী)

প্রদীপ্ত বর্মন (অধ্যাপক)

শুভায়ুর রহমান (কবি ও সাংবাদিক)

ডা. আমানুল হক (কলকাতা বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার)

অরুপ কুমার রায় (আই.সি কান্দী থানা)

বজলে মুর্শিদ (বিশিষ্ট শিক্ষক ও লেখক)

ডা. ঔরঙ্গজেব (কলকাতা এন আর এস হাসপাতাল)

ডা. আনজুমান আনসুরা মামনী (ডোমকল মহকুমা হাসপাতাল)

নীলয় বাগচী (কবি)

হাবিবা খাতুন (কবি)

আজকার আলী (শিক্ষক)

রেসমিন খাতুন (গল্পকার)

দেশের সীমান্তে শহিদ হওয়া প্রতিটি বীর জওয়ানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি...

সূচিপত্র

গল্প

প্রবন্ধ

কবিতা

১৩৪/ জ্যোৎস্না রহমান/১৩৬/ প্রদীপ্ত বর্মন/১৩৭/ সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায়/১৩৮/ দীনমহাম্মদ সেখ/১৪০/ সৌরভ আহমেদ সাকিব/১৪১/ কবীর হোসেন/১৪২/ জয়নূল আবেদীন/১৪৪/ নাসরিন নাজমা/১৪৮/ রাজকুমার শেখ/১৫০/ নীলয় বাগচি/১৫১/ উম্মে সালমা/১৫২/ নূর - এ - সিকতা/১৫৩/ খুরশিদ আলম/১৫৬/ ফারুক হাসান/১৫৮/ মাহমুদুল হাসান নিজামী/১৫৯/ হাবিবা খাতুন/১৬১/ সুদীপ্ত বিশ্বাস/১৬৩/ সুরাত আলি/১৬৬/ হামিম হোসেন মণ্ডল/১৭১/ জারা সোমা/১৭২/ রাজেশ পাল/ ১৭৫/ মর্জিনা খাতুন (এঞ্জেল)/১৭৭/ ইব্রাহিম বিশ্বাস/১৭৯/ মহম্মদ আলামিন/১৮১/ রাকা ব্যানাজী/১৮২/ হাবিব মন্ডল/১৮৩/ সম্পা পাল/১৮৪/ পার্থসারথী সেনগুপ্ত/১৮৬/ মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি/১৮৭/ পাভেল আমান/১৯০/ শক্তি প্রসাদ ঘোষ/১৯২/ দুলাল সুর/১৯৩/ শেখ রমজান আলী/১৯৫/ অসিত কুমার রায়/১৯৭/ আনসারুল ইসলাম/২০০/ সহিদুল ইসলাম/২০৩/ আলামিন ইসলাম/২০৪/ মমতাহেনা খাতুন/২০৫/ আকাশ আহমেদ হিমু/২০৭/ আলিয়া খাতুন/২০৯/ মানস মৈত্র/২১০/ জাহিদুল ইসলাম/২১৩/ সাব্বির আহমেদ অপু/২১৫/ সফিউদ্দিন বিশ্বাস/২১৭/ মহ. সুবল হোসেন/২১৯/ পলাশ শেইখ/২২২/ শিউলি খাতুন/২২৪/ অনুপম গিরি/২২৫/ সামুন ফরিদ/২২৭/ উমর ফারুক/২২৯/ ওয়াসিম রেজা/২৩১/ শিরিন আক্তার মন্ডল/২৩৩/ কিরণ শেখ/২৩৫/ শামীম বাদশা শেখ/২৩৭/ মুস্ফাজুল ইসলাম/২৪১/ সুজাতা মুখার্জী/২৪২/ রাজু মন্ডল/২৪৪/ বদরুদ্দোজা শেখু/২৪৬/

গল্প

পাড়ি

শুভায়ুর রহমান

সুলতানগঞ্জ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কিমি খানেক। কয়েকটি বাঙালি মেসের ছেলেরা সকাল ন'টা থেকে স্নানের জন্য লাইন দিতে থাকে। চোখ মুছতে মুছতে সিয়াম প্রেসার কুকারটা চাপিয়ে বাথরুমে ঢোকে। বাথরুম থেকে আশিককে ভাত টা নামিয়ে দিতে বলে। কিছুক্ষণ পরে নাকে মুখে গোঁজা শুরু হয়। আলু সেদ্ধ আর প্রেসার কুকারের পোড়া ভাত অমৃত। খেতে খেতেই আশিক, সিয়াম আর সুফিয়ানরা আলোচনা করছিল আফরিনকে নিয়ে।

আফরিন ক্লাসমেট। পড়াশুনোর পাশাপাশি আঁকতে পছন্দ করে।দেখতেও তেমনি সুন্দরী ও নাদুসনুদুস। আফরিনের সাথে সিয়ামের সম্পর্ক সব চেয়ে ভাল। উত্তর বঙ্গের মেয়ে আর দক্ষিণ বঙ্গের ছেলের সাথে সুমধুর সম্পর্ক দেখে অনেকেরই চোখ টাটাই।

সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেয়ারওয়েলের মিটিংয়ে ওরা অনুপস্থিত। দাদারা চলে যাবেন। সংবর্ধনা দিতে হবে। আলোচনার আগে কে যেন বলল "আফরিন ও সিয়াম নেই, আলোচনা কি হবে?"

কথা টি তোলা মাত্রই ইমরান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল"ওদের কবে পাওয়া যায়? ওরা তো কৃষ্ণাঘাটেই সারা দিন বসে থাকে। ওদের ছাড়াই আলোচনা হবে।"

গ্রামের ছেলে সিয়াম, অভাবী পরিবার। গ্রাম ছেড়ে অজানা পাটনা শহরে এসেছে। তার সুন্দর কাব্যিক ভাষা ও লেখালেখির দক্ষতা দেখে ক্লাসে সবাই কম বেশি ভালবাসে। একমাত্র ব্যতিক্রম ইমরান। তার চোখের বালি সিয়াম। ইমরান ধনী ঘরের ছেলে দেখতে বেশ নজর কাড়া, হৃৎপুষ্ট ফিগার। এরপরও লেগে থেকে মাঝ দরিয়ায় প্রেমের তরী ভাসাতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে উত্তর থেকে দক্ষিণে উথালপাতাল গঙ্গা বয়ে চলছে। নৌকা নিয়ে ভেসে যাচ্ছে মাঝিরা। একশো মিটার দূরে কৃষ্ণঘাট। ঘাটে বসে দুজনে কাছাকাছি বসে গল্প করছে।সিয়ামের কবিতার লাইন শুনতেই আফরিন এই ঘাটে জোর করে ডেকে নিয়ে আসে। "আজ ভারী গঙ্গায় স্রোত যেন একটু বেশি। স্রোতের সাথে সেই কবিতা টা আবৃত্তি করো না" জানায় আফরিন।

সিয়াম বলে "কোন কবিতা? "

-দেখছ? তুমি ভুলে গেছ! পরশু হোয়াটস এপে যেটা লিখে পাঠালে।

-কিন্তু সেটা তো তোমার মোবাইলে আছে পড়ে নাও।

-আমি কেন? পড়ব? তোমার মুখ থেকে শুনব। বলো, তার জন্য তোমাকে আমি মাইনে দিই! বলে হেসে উঠল আফরিন।

কথাটি কর্নগোচরে যাওয়া মাত্র সিয়ামের গোটা শরীরে যন্ত্রণা উঠল। তীরের মতো ফালাফালা করে দিল সিয়ামকে। অভাবী পরিবারের ছেলে। বাড়ি থেকে যা টাকা দেওয়া হয় পড়ার জন্য তা যথেষ্ট নয়। বাড়ির উপার্জন তেমন নেই। প্রতিবার যখন বর্ধমান স্টেশন থেকে সিয়াম হাওড়া-পাটনা দানাপুর এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে। তখন থেকেই হা... হুতাশ শুরু হয়ে যায়। আফরিনের মুখের কথা শুনে লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল সিয়ামের চোখ মুখ।

-কি হল? চুপ করে গেলে যে? জিজ্ঞাসা করল আফরিন।

-নাহ! তেমন কিছুনা।

আফরিন বলল 'আরে তোমাকে মজা করে বলছিলাম।

-না, আফরিন তুমি ঠিকই বলেছে। আমার গোটা মাস টানাপোড়েন চলে।

তুমি আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করো। সেটা তো অস্বীকার করতে পারি না!' কাঁপা গলায় বলল সিয়াম।

-শোন সিয়াম।

-হ্যাঁ বলো।

-সিয়াম মাথা তোল। হেঁট হয়ে আছো কেন? আমার দিকে তাকাও।"

আফরিনের দিকে একবার তাকিয়ে মুখটা নীচু করলো। দু,চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সিয়ামের।

মজার ছলে হলেও কথা টি বলে অপরাধ করেছে। মনে মনে নিজেকে অপরাধী মনে করে আফরিন। দুজনই যেন চুপ করে গেছে। ততক্ষণে দুজনের মধ্যে অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে। সিয়াম যেন নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে নিয়েছে।

আফরিন অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে সিয়ামকে বলে "তুমি আমায় বিশ্বাস করো?"

-হ্যাঁ।

-তুমি আমাকে ভালোবাসো?

-হ্যাঁ।

তবে কেন? আমার কাছ থেকে গুটিয়ে নিচ্ছ। কাছে এসো। কিছুটা বিরক্তির সুরে সিয়ামকে নির্দেশ করে।

সিয়াম, আফরিনের কাছে আসা মাত্রই জড়িয়ে ধরে জানায় "প্লিজ... ভুল বোঝ না। আমায় ক্ষমা করে দাও।"

এত সাহসী পদক্ষেপ আগে দেখেনি সিয়াম। সিয়ামের বুকে তখন গঙ্গা ফুলে উঠেছে। গঙ্গার পাড়ের কাশবন যেন আনন্দে নাচছে। দূর জাহাজ গতি বাড়িয়েছে। ঢেউদের মচ্ছব শুরু হয়েছে যেন। বুকের পাঁজরে শুধুই প্রেমের জয়োল্লাস। সিয়ামের ধমনীতে নায়াগ্রার জলপ্রপাত তার পরও নিজেকে সংবরণ করে, সিয়াম জোর পূর্বক নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে"কি করছ আফরিন? অন্যরা দেখছে তো?

-মানে কি? ওরাও তো প্রেম করতে এসেছে

ওরাও কম যাচ্ছে না। তুমি এত ভিতু কেন? আচ্ছা চলো এখন ফিরে যাই। মেসে যেতে হবে।" সিয়ামও ঘাড় নেড়ে সহমত জানায়।

(২)

আজ সিয়াম ক্লাসে আসেনি। তার জ্বরটা বেড়েছে। ডিসপেনসারি থেকে পাওয়া প্যারাসিটামলই ভরসা। ক্লাসে আফরিনের পাশে ইমরান বসেছে। প্রথম ক্লাস শেষ হলে ইমরান আফরিনকে জানায় "আজ একটা রিকোয়েস্ট রাখবি?"

-হ্যাঁ বলে ফেল।

-না এখানে নয়। চল ক্লাস ঘরের পিছনের বারান্দায় চল। গঙ্গা দেখব আর বলব।

ইমরানের সাথে হনহন করে ক্লাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আফরিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে দেবদারু গাছের ডাল ধরা যায়।ইমরান কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে জানাল"আফরিন আর একবার ভেবে দেখ। আমি কি তোর যোগ্য নই। আমার গাড়ি, বাড়ি সবই আছে। আমি কি তোকে সুখি করতে পারিনা?

ইমরানকে আশ্বস্ত করে আফরিন উত্তর দেয়"নিশ্চয় সে ক্ষমতা তোর আছে।

কিন্তু আমি সিয়ামকে অনেক ভালবাসি। জানি তার চেয়ে তুই অনেক বেশি সুদর্শন কিন্তু তার মধ্যে আমি অনেক কিছু খঁজে পেয়েছি।' কথাটি শেষ হতে না হতে আবারও প্রশ্ন ছুড়ে দিল ইমরান"ও তোকে কতটা ভালবাসে?

"আমি তোর উত্তর দিতে বাধ্য নই "বলে আফরিন উত্তেজিত হয়ে বারান্দা থেকে চলে আসল।

কয়েকদিন পরে সানার সাথে পাটনা মেডিক্যাল কলেজের সামনে সিয়ামের আচমকা দেখা।

-আরে সিয়াম তুমি? জিজ্ঞাসা করে সানা।

সিয়াম অধিকাংশ দিন দু'কিমি পায়ে হেঁটেই বিশ্ববিদ্যালয় যায়।পাছে অটোর ভাড়াটা বেঁচে যায়।

সানার কথা শুনে থমকে যায় সিয়াম।

-সানা, তুমি।

-হ্যাঁ আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। আসলে তোমার সাথে একটু দরকার আছে।

আশ্চর্য হয়ে সিয়াম বলল "আমার সাথে!"

-কেন? তোমার সাথে দরকার থাকতে পারে না।?"

-অবশ্যই। বলো কি দরকার?

এখানে নয়। চলো অন্য কোথাও কিংবা কৃষ্ণাঘাটে যাই।

সিয়াম মনে মনে ভাবলো ওখানে তো আফরিনের সাথে দেখা করতে হবে। কয়েকদিন ক্লাসে আসিনি। ফলে ফোনে কথা ছাড়া সামনাসামনি দেখা না হওয়ায় মনটাও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

-কি হলো চলো?

আর রা কাড়তে পারল না সিয়াম।

দুজনে কৃষ্ণাঘাটে পৌঁছল। সানা দূর গঙ্গায় তাকিয়ে বলল"আচ্ছা সিয়াম ওই যে জোয়ার দেখছ সেটা কি থামিয়ে দেওয়া সম্ভব?

-একদমই নয়। ওটা প্রাকৃতিক নিয়ম। সে বহুদূরে অজানা পথে অসীম হয়ে এগিয়ে যাবে। মৃত্যু নেই, শুধুই বেড়ে চলা গভীর থেকে গভীরে "বলল সিয়াম

-তাহলে আমার মনের জোয়ার কি করে থামাব? বলে সিয়ামের হাত দুটি ধরল সানা।

-ছিঃ ছিঃ হাত ছেড়ে দাও" যতই বলছে সিয়াম, ততই চেপে ধরছে সানা।

হঠাৎ সিয়ামকে বধ করে দিল দূর দৃষ্টি। আফরিন দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে। ঝাড়া মেরে সানার কাছ থেকে দৌড়ে যায় সিয়াম। ততক্ষনে সিঁড়িতে আফরিন। পথ আটকায় সিয়াম। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকে। দুজনের বাকবিতণ্ডা দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ক্লাসের অন্যরা সিঁড়ির মুখে চলে এসেছে।

-আমার টাকায় পড়ছ! আমার সাথে বেইমানি করলে স্বার্থপর বলে সিয়ামের গালে সপাটে চড়।

লজ্জায়, রাগে, ক্ষোভে ঘৃণায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গেল সিয়াম। ঘরে ফিরে সিয়াম আফরিনের হোয়াটসঅ্যাপে লিখলো-" কোথা থেকে শুরু করবো বুঝে উঠতে পারছি না। তবুও লিখতে হয় যে দুর্মূল্য পৃথিবীতে আমাদের দর কষাকষিটাই যেন সস্তার। ভালোথাকার পাসওয়ার্ড যখন হারিয়ে যায়, তখন সময়টাই কাঁচঘরে বন্দী মাছির মতো নিঃশেষিত হয় সাদাকালোর মোড়কে। ভালোবাসা অনাথ শব্দ, তাই চলে যাওয়ার মুহূর্তে কাউকে কৈফিয়ত দেওয়া লাগে না। পাঁজরের কুঠি বাড়ি থেকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলাম। ক্লান্ত সময়ে একা থাকা, এবার ঘরে ফেরা। পড়াশোনার জন্য পাটনাতে পাড়ি দিয়েছিলাম। কিন্তু এ শহর আমার জন্য নয়, ভালো থেকো।" ব্যাগপত্তর গুছিয়ে মেস থেকে বেড়িয়ে পড়লো সিয়াম।

(৩)

আশিক, বিশ্বজিৎ সুফিয়ান রা দেখল ব্যাগ পত্তর গুটিয়ে সিয়াম চলে গেছে।

সবার মধ্যে চাপা গুঞ্জন শুরু হল। সিয়াম তো এই রকম ছেলে নয়। কারও বিশ্বাস হচ্ছে না। মনমরা হয়ে গেল আফরিন। বারংবার হোয়াটসঅ্যাপ বক্স খুলে আফরিন শেষ মেসেজে চোখ বুলোয়। খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়েই দিল আফরিন। আফরিনের নিঃসঙ্গ সময়ে ইমরান সঙ্গ দিতে থাকল।

কয়েক মাস পরে মেসে ইমরানের ঘরে এসেছে আফরিন। ইমরানের জন্ম দিনে আফরিন শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে। ইমরানের ঘর থেকে ওরা বন্ধুদের সাথে নিয়ে গান্ধী ময়দানের একটি রেস্তরাঁয় যাবে। তার আগে ঘরে ইমরান আফরিনকে বলল তুমিই আমার কাছে শুভেচ্ছা, ইচ্ছা, ভরসা তুমিই আমার গিফট। এর চেয়ে আর কি চাইব? বলে আফরিনের হাত দুটি ধরল ইমরান। আফরিন বাধা দিল কিন্তু পেরে উঠল না। আফরিনের ঘাড়ে, চিবুকে চুমু দিতে থাকলো। সমস্ত শ্বাসচাপ বয়ে চলেছে দুজনের মধ্যে। আফরিনের নাভীতে ইমরানের ঠোঁট কিলবিল করছে। ইমরানের মুষ্ঠিবদ্ধ আফরিনের স্তন যুগল। অবিরাম গরম শ্বাস প্রশ্বাসে দুজনে হারিয়ে গেল বিভোর জগতে। একটু পরে ভুল ভাঙল আফরিনের। ইমরানের দিকে আর তাকাতে পারছে না। ছিঃ কি সব হয়ে গেল! আর এক মুহুর্তে ইমরানের ঘরে থাকতে চায়না। বের হয়ে গেল ইমরানের ঘরথেকে।

কয়েক দিন পরে সানা আফরিনের মেসে গিয়ে হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

-"ভুল করেছি। আফরিন মারাত্মক ভুল। তুই আমাকে ক্ষমা করবি কি জানি না। তবে এই ভুলের কোন ক্ষমা হয় না আমি জানি। আমি তোর সিয়ামের জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছি।"

-কি বলছিস তুই? মানে কি? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে আফরিন।

-এটাই সত্যি। ইমরানের প্রলোভনে পড়ে আমি গঙ্গার ঘাটে সিয়ামকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি ওকে জোর করেছিলাম। যাতে তুই দেখতে পাস। তুই ঘাটে গিয়েছিলি তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু আমি ইমরানের কথা শুনে। ইমরানের মুখোশ আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বড্ড দেরি হয়েগেছে রে। আজ সকালে সন্দীপকে ফোন দিয়েছিল সিয়াম।'

বিমানে ওঠার আগে সিয়াম বলেছিল' জানি না কি দোষে আমি অপরাধী হলাম। তুই অন্তত আমাকে বিশ্বাস করবি। আমি সানার সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। তোদের সঙ্গে আমি দূরে থাকতে মোবাইল অফ রেখেছিলাম। আজ আমি কাতার পাড়ি দিচ্ছি। তেল কোম্পানির কাজে। পাটনার পর এবার অন্য দেশে। সুফিয়ান আসিফ, আশিক, হারুন, তোরা সবাই আনন্দ কর। পারলে ক্ষমা করিস।"

সব কথা শুনে থ মেরে গেল আফরিন। টেবিল থেকে মোবাইলটা নিয়ে ফোন দিল সিয়ামকে।" ফোন লাগলো না। সিয়ামের চলে যাওয়ার দিন থেকে যতবার ফোন দিয়েছে আফরিন নট রিচেবেল বলেছে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়।

কোন কথা বলতে পারল না।আফরিন। কষ্টের বাঁধ মানল না। অত্যধিক দুঃখে, অভিমানে চোখের জল নিয়ে ঘরের মেঝেয় কান্নায় ভেঙে পড়ল আফরিন। আফরিনের বুকে বাজতে থাকলো শেষ মেসেজ "পাঁজরের কুঠিবাড়ি থেকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলাম।"

হয়তো কাতারগামী বিমান ছেড়ে দিয়েছে কিংবা বিমান ল্যান্ড করেছে। আর পিঠে ব্যাগ নিয়ে সিয়াম অদেখা নতুন শহরে মিশে গেছে, ভাবতে থাকলো আফরিন।

শব ব্যবচ্ছেদ

আবু তাহের

আজ আকাশটাকে কেউ যেন একটা ছাতার ডাঁটি দিয়ে গুঁতিয়ে ফুটো করে দিয়েছে। মাথার ভেতরে দপদপ করে আগুন জ্বলার মতো অনুভূতি হচ্ছে। তবুও এক মাইল হেঁটে ব্যাঙ্কে যেতে হবে। সরকার থেকে নাকি সবাইকে পাঁচশো টাকা করে দিয়েছে। একটা বিধবা ভাতার জন্য ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিল গ্রামের মেম্বার আসাদুল। কিন্তু কী এক মসিবৎ এলো রে বাবা!বাপের জন্মেও নাকি তার নাম শোনেনি সুফিয়া বেওয়া।

সুফিয়া বেওয়ার টাটির বাড়ি। চোখে সে খুব পরিষ্কার দেখে না। তাও সে পাড়ায় সবার মুখে শুনছে করোনা না কি এক অসুখের কারণে সরকার পাঁচশ টাকা করে দিয়েছে।

"হ্যাঁ গো লালবুড়ির মা সবাইকে কি দিছে টাকা? আমার টাকাটা একটু তুল্যা আন্যা দে না বাছা।"

লালবুড়ির মা একটু তার কথায় গুরুত্ব দেয়। কখনো কলমির শাক, কখনো দুটো সজনে ডাঁটা দিয়ে সাহায্য করে।

" কিন্তু বড়মা আপনাকেই যাত্যে হবে, না হোল্যে জি টাকা তুলা যাবে না।" মুখে একটু করুণা ফুটিয়ে উত্তর দেয় সে।

"চলেন আমিও যাব আজ আমার সাথে যাবেন।"

এত সম্মান দিয়ে কেউ তাঁকে কথা বলে না। সবাই তাকে তুই তোকারি, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।

সুফিয়া বেওয়া তার একটা পুরনো ছাতা নিয়ে হাঁটতে থাকে লালবুড়ির মায়ের সাথে। অনেকখানি রাস্তা।পিচ রাস্তা হয়েছে ক'বছর হলো। পিচের রাস্তার তাপে টেকাই মুস্কিল। গরমে গা পুড়ে যাচ্ছে। রাস্তায় যেতে যেতে আসাদুলের সাথে দেখা।

"কুনঠে যাছো চাচি?" জিজ্ঞেস করে গ্রামের মেম্বার।

"ব্যাঙ্কে নাকি টাকা দিয়্যাছে বেটা তাই তুলতে যাছি।"

ব্যাঙ্কে পৌঁছে দেখে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। লকডাউনের দফারফা করে ছেড়েছে মানুষ। কোথায় সোস্যাল ডিসট্যান্স! একেবারে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ।

সাহেবনগর ব্যাঙ্কের গোড়া থেকে একেবারে প্রাইমারি স্কুলের শেষ মাথা অবধি লম্বা লাইন। এত লাইন জীবনেও দেখেনি সুফিয়া বেওয়া। শেষ মাথায় গিয়ে দাঁড়াতে হলো বাধ্য হয়ে। সকাল বেলায় ভালো করে কিছু খেয়ে আসা হয়নি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার। লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষের গুঁতোগুতি লেগেই আছে। বয়স্ক মানুষ, সে কেন এদের সাথে পারবে! পেছন থেকে লাইনের কেউ ঠেলা দিলে সামনে হুড়মুড়িয়ে পড়ছে। তখন সামনের লোক এমন ঝাঁঝালো কথা শোনাচ্ছে যে শুনে গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে।

লালবুড়ির মা বললো, " বড় মা আপনি একটু বসেন ছাওয়াতে যায়্যা।"

আমগাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসতেই তার একটু ঝিমুনি এসে গেছিল। আঁচল থেকে তার দশ টাকার তিনটে নোট কে যেন খুলে নিয়ে পালিয়ে গেল।সে বোঝার আগেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল সেই চোর।

মানুষের মনুষ্যত্ব কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে একজন বিধবা গরিব মানুষের কাছেও চুরি করতে ছাড়ছে না!শুনে লালবুড়ির মা'র চোখে জল এসে গেল। এই বুড়ি মানুষটাকে সেই একমাত্র দেখেছে, কোনোদিন লজ্জার মাথা খেয়ে কারো কাছে কিছু চাইতে পারে না। হাত পেতে কখনো কারো কাছে কিছু চাইতে দেখেনি। সংসারে এই মানুষ গুলোর দুর্দশার শেষ নেই।

কিন্তু যাদের চোরের মায়ের মত বড় গলা তারাই এখানে ওখানে ফাঁকফোকর

দিয়ে নানান কাজ হাসিল করে নেয়।গ্রামে যেসমস্ত অনুদান আসে তার ঠিকমতো সে খোজই পায়না। সব যায় ওই চিরদিনের কাঙাল নেতাগুলোর পেটে। কিন্তু তাতেও বিশেষ আক্ষেপ নেই তার। বাড়ির ফেরার পথে সে কিছু তরিতরকারি কিনে ফিরবে ভেবেছিল।

কিন্তু যখন সে তাদের লাইন গেটের কাছাকাছি চলে এল তখন যেই সে তার আগের জায়গায় ফিরে আসতে যাবে অমনি শুরু হলো বেজায় গালিগালাজ।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ ছুড়ে দিল নানারকম উটকো মন্তব্য। "এই বুড়ি গুলো মরেও না। আরাম ক্‌ইরা বাগানে বসে থাকব্যে আর আমরা রোদহে পুড়্যা মরি!"

লাইন যখন ভেতরে ঢুকলো তখন সুফিয়া বেওয়া তার বইখানা চেক করানোর জন্য এগিয়ে দিল। নির্বিকার মুখে কর্মচারী আপডেট করার পর দেখে বললো "তোমার টাকা ঢোকেনি।"

"টাকা ঢুকেনি মানে? আমরা কি খাত্যে পাবনা? লালবুড়ির মা কী বুলছে দেখোতো।" সুফিয়ার মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে।

"আপনি সরে দাঁড়ান এরপরের লোককে আসতে দিন।" ব্যাঙ্কের কর্মচারী

ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

পেছন থেকে ভিড় এমন একটা ধাক্কা মারলো যে সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মেঝের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মাথা ফেটে রক্ত বেরোতে লাগলো।

সিভিক পুলিশের কিছু ছেলে ওখানেই ছিল। ধরাধরি করে সুফিয়া বেওয়া কে নিয়ে যাওয়া হলো কানাপুকুর ব্লক হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রেফার করে করে দেওয়া হলো বহরমপুর মেডিকেল কলেজ। পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা।লালবুড়ির মা আছে সাথে। সুফিয়া কোনো কথা বলতে পারছে না। ডাক্তার বলেছে মাথার ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাড়াতাড়ি মাথার ছবি না করলে কিছু বলা যাবে না। কাউকে খবর দেওয়ার মত নেই। কেউ একটা সাহায্য করার মতোও নেই এইসময়ে। অসহায়ের মত চোখমুখে ফ্যাকাশে দেখায় লালবুড়ির মা'র।

বহরমপুরে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করানোর পর ছবি হলো মাথার। ডাক্তার জানালো বাঁচার আসা কম। সেদিন রাত আটটার সময় মারা গেল সুফিয়া বেওয়া। পোস্ট মর্টেম হবে। ব্যবচ্ছেদ হবে তার। পোস্ট মর্টেম হওয়ার পর রিপোর্টে বললো মাথার ভেতর হেমারেজ হয়ে মারা গেছে সুফিয়া বেওয়া। কিন্তু কী কারণে রক্তক্ষরণ তা আর জানা গেল না!

ভাংড়িওয়ালা

মুহাম্মদ জিকরাউল হক

বয়স পঞ্চাশের প্রৌঢ়। প্রায়ই হাঁক দিয়ে যায় বাড়ির পাশ দিয়ে। ভাংরি ওয়ালা। ভাঙ্গা টিন, লোহা, তামা, কাঁচ,পুরাতন প্লাস্টিক কিনে বেড়ায়।

নড়বড়ে সাইকেল। তাতে দুটো ঝুড়ি বাধা। টানতে কষ্ট হয়। তবু টানে। টানতে টানতে লোকটিও থুত্থুরে হয়ে গেছে। হালকা গড়ন। বেঁটে-খাটো মানুষ।

ইলিয়াস সাহেব ছাদ থেকে দেখেন মানুষটাকে। মায়া হয়। তাঁর বাড়িতেও জমা হয় পুরাতন পেপার, বই-খাতা, প্লাস্টিক। তিনি জমিয়ে রাখেন। মাঝেমধ্যে ভাঙড়িওয়ালা ডেকে বিক্রি করে দেন। এই লোকটিকে দেখার পর থেকে তার কাছেই বিক্রি করেন। তাকে দেখতে না পেলে অপেক্ষা করেন। অন্য কারো কাছে আর বেঁচেন না।

দাম দর করেন না। লোকটি যে দর বলে সে দরেই দিয়ে দেন। হোক না লোকটির দু-দশ টাকা!

সেদিনও ডেকে মাল দিলেন। মোট চুরাশি টাকা হল।

ইলিয়াস সাহেব বললেন, 'আশি টাকা দিলেই হবে।'

লোকটি একশ টাকার নোট দিলে ফেরতের কুড়ি টাকা আনার জন্য তিনি বাড়ির ভেতর গেলেন।

ইলিয়াস সাহেবের স্ত্রী দাঁড়িয়ে লোকটির মাপ করা দেখছিলেন। প্রত্যেকবারই দেখেন।

কুড়ি টাকা নিয়ে এসে ফেরত দিলে দু'জনে বাড়ির ভেতর আসেন ।বাড়ি এসেই তাঁর স্ত্রী গম্ভীর হয়ে যান। গজগজ করতে থাকেন রাগে ।

'রেগে আছো কেন?'

'তোমাকে কে বললো আমি রেগে আছি?' 'তবে কথা বলছো না যে?'

' কথা বলার তো কিছু নেই।'

'গরিব মানুষ। খেটে খায়। তার উপর বুড়ো। না হয় চার টাকা কমই নিলাম।' 'টাকা না নিলেও পারতে। মাত্র আশি টাকা তো!'

'ও! এইজন্য রেগে আছো ?'

'না। আমি রেগে আছি তোমার ভালো মানুষি দেখে।'

' মানে?'

'তুমি কি জানো লোকটা কি বলে গেল?'

'কি বলে গেল?'

' বলে গেল, এটা আপনাদের ভাড়া বাড়ি না? আমি বললাম, হ্যা । আবারো জিজ্ঞাসা করল, কতদিন ধরে ভাড়ায় আছেন ? উত্তর দিলাম, পনের বছর

ধরে। শুনে কি বলল জানো ?'

'কি বলল?'

' বলল, তবে চাকরি করে করলেন কী? আমি এই ব্যবসা করেই পাকা বাড়ি করেছি। দুই বিঘা জমি কিনেছি। ছেলে- মেয়ের বিয়ে দেবো বলে টাকা জমিয়ে রেখেছি। মাস্টার খুব ভালো মানুষ। বিয়ে লাগলে নেমন্তন্ন করব। যাবেন কিন্তু। আমার বাড়িটাও দেখে আসা হবে।'

তরমুজ রঙা দেওয়াল

রেশমিন খাতুন

অনিমার সঙ্গে দেখা হলো হঠাৎই। বাস ধরব বলে দাঁড়িয়ে আছি এবং এই বাসের জন্য অপেক্ষা করাটা পৃথিবীর বিরক্তিকর কাজ মনে হয়। পাঁচটা মিনিট সময় ও যেন অচল হয়ে থাকে। বাস ঢুকছে, পলকে চলমান হচ্ছে, হুস করে অন্যরুটের যাত্রীদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। খয়েরি ব্লাউজ, সবুজ সাদায় মেশানো শাড়ি, আঁট করে খোঁপা। অনিমাকে চিনতে সময় লাগল না। মুখটা ঘামে ভিজে গেছে। বেশ রোগা হয়ে গেছে।

"অনিমা"

"দিদি, তুমি ভালো আছো? এদিকে কোথায়?"

"যাবো একটু আট ঘড়া। কেমন আছিস?"

"ভালোই" হেসে উত্তির দিলো অনিমা। হাসিটার মধ্যে আগের উচ্ছলতা না থাকলেও প্রাণ ছিল।

"খুব রোগা হয়ে গেছিস।"

"আর বলেন না, সংসারের যত কাজ, নিজের কাজ তার উপর ছেলে সামলানো"

"শ্বশুরবাড়িতে আছিস তো?"

"হ্যাঁ, ওখানেই আছি।"

মুখটা বিকৃত করল।

কথায় কথায় শ্বশুরবাড়ির অশান্তির কথা, কলোনিতে জমি কেনার কথা বলল।

"তাই নাকি! ওখানে তো জমির এখন অনেক দাম।"

"আমার গয়নাগুলো বন্ধক দিয়ে, লোন নিতে হয়েছে। এখন ওর আর আমার মাইনের বেশিরভাগ টাকাটাই লোন শোধ করতেই যাবে।"

অনিমার বাস আসতে সে বিদায় নিলো। সারাদিন অনিমার চিন্তা ঘুরে ফিরে আসছিল। স্মৃতিই এরকম। চাপা পড়ে থাকে, তখন থাকে। আবার যখন ছিপি খুলে যায় তখন হুস হুস করে সমস্ত বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।।

বছর চারেকের ছোটো হবে অনিমা আমার চেয়ে। টিউশন ব্যাচের সেই ফুটফুটে কিশোরি আজ পোড় খাওয়া সংসারী। ভবিষ্যত নিয়ে ভাবিত একজন মা। মাধ্যমিকের অঙ্কের ব্যাচে ও ছিল দলছুট। কথার খই ফুটত সর্বক্ষণ। আমরা ওকে নিয়ে মজা করতাম। ও তাতে কোনোও দিন দমত না। রাখীবন্ধনের দিনে একগাদা রাখী এনে সবার হাতে বাঁধত, আর ওর হাত ভরে উঠত চকোলেটে।

বছর তিনেক পরে অনিমার সঙ্গে আবার দেখা হলো রাস্তাতেই। আরো শীর্ন এবং বয়স্ক দেখাচ্ছে। কলোনিতে বাড়ি প্রায় শেষের মুখে, এই খবরটা পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম।

"যাক, এবার তোর কষ্ট যাবে"

"হ্যাঁ দিদি, কষ্ট বলে কষ্ট। সেই কোন ভোরে উনুনে আঁচ, সংসারের সব কাজ, ছেলেটা পিছন পিছন ঘোরে। একবার কোলেও করতে পাই না। তারপর আমাদের কাজের ও খুব চাপ। বাড়ি গিয়েই আবার উনুনের সামনে বসা।"

"তোর শরীর কিন্তু খুব ভেঙে গেছে। শরীরের দিকে নজর দে।"

"আর শরীর! কী কষ্ট করে চালাচ্ছি। সামান্য হাত খরচটুকুও বাঁচিয়ে রাখি। এই কয়েক বছর একটু ভালো খাওয়া না, একটা ভালো শাড়ি না, কিচ্ছু না। মাস তিনেকের মধ্যে ও নরক ছাড়ছি, তারপর বাকি জীবনটা তো রইল সাধ আহ্লাদের জন্য। "

"ইচ্ছে রইল তোর নতুন সংসার দেখার।"

"হ্যাঁ দিদি, যাবেন। ঘরের ভিতরটা তরমুজের গায়ের মত রং করিয়েছি।"

"ভালোলাগবে?"

"ও বলছিল একটু পুরাতন হয়ে গেলে কালচে লাগবে। "

"ঠিক আছে, একদিন গিয়ে দেখে আসব"

দ্বিতীয়বার ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বেশ দীর্ঘদিন কেটে গেছে। এতদিন হয়তো নতুন সংসার গুছিয়ে ঘর করছে। যাবো যাবো করেও যাওয়া হয়নি এখনো পর্যন্ত ওর তরমুজরঙা দেওয়াল দেখতে।

আমার এক আত্মীয় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিল, তাকে দেখতে

গিয়েছিলাম। অনেকটা সুস্থ দেখে আশ্বস্ত হলাম। এখান থেকে কলোনি বেশী দূর হবে না। শহরের লাগোয়া তবে এখনো বেশ ফাঁকা ফাঁকা আছে। ওর স্বামীর নাম। বলতে পাড়ায় একজন দেখিয়ে দিলো বাড়িটা। সামনে রেলিং দেওয়া বারান্দা কলিং বেল বাজার কিছুক্ষণ পরেই দরজাটা খুলল একটা ২৬-২৭ সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। একটু থমকে গেলাম। ঠিক বাড়িতে এলাম তো?

"এটা কি সুবীর মন্ডলের বাড়ি?"

"হ্যাঁ, আসুন।"

বেশ সাজানো একটা ছোট্ট ঘরে মেয়েটি বসালো আমাকে।

অনিমা কোথায়? মেয়েটাই বা কে? কোনোও আত্মীয়া?

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি শরবৎ নিয়ে ফিরল। সত্যি প্রচন্ড তেষ্টা পেয়েছিল। এক নিশ্বাসে শরবতটা শেষ করলাম।

"অনিমা নেই? ওর হাজবেন্ড আছে?"

মেয়েটি একটু অবাক হলো।

"আপনি জানেন না?"

"কী জানব?"

"অনিমা, মানে অনিমা দি তো একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে...."

পায়ের তলা থেকে মাটিটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। নিজের অজান্তেই

উঠে দাঁড়ালাম।

"কবে হলো?"

গলাটা তীক্ষ্ণ শোনালো।

"গত বছর কালী পুজার সময়।"

"তুমি কে?"

এবার মেয়েটি একটু লজ্জা পেলো।

"আমি ওনার দ্বিতীয় পক্ষ"

এবার ও আমার আমূল চমকে ওঠার পালা। মেয়েটার দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করছিল না। ঘৃণায়, বিদ্রুপে শুধু বলতে ইচ্ছে করছিল, "শাবাশ"। কিন্তু একে বলে কী লাভ?

বারবার শুধু চোখ চলে যাচ্ছিল তরমুজ রঙের দেওয়ালটার উপরে। যার ভিতরে লুকিয়ে আছে সেই হতভাগিনীর অনেক অনেক রক্ত......

ভালোবাসার বিদায়

মিনহাজ উল কবীর

ফোনটা ভাইব্রেট করেই চলেছে।স্ক্রিনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, হাত কাঁপছে। এতদিন, এতবছর পর আবার সেই নম্বর থেকে ফোন এসেছে, বিশ্বাস হচ্ছে না। আজও নম্বরটা দেখে হৃদ স্পন্দন কয়েক গুণ বেড়ে যায়, মনের মধ্যে দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে যায়।শেষ পযন্ত ফোনটা রিসিভ করেই ফেল্লাম।ওপাশ থেকে ভেসে এলো সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর । এতবছর পরও একটু বদলায় নি।সেই আগের মতোই আছে...হ্যালো... কি হলো কিছু বলছো না যে?না আসলে পাঁচ বছর পর এই নম্বর থেকে ফোন আশা করি নি, তাই বুঝতে পারছি না যে কী বলবো?কয়েকদিন থেকেই তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল। কিন্তু ফোন করার ঠিক সাহস পাচ্ছিলাম না।কাল থেকে তোমার কণ্ঠস্বর শোনার খুব ইচ্ছে করছিল, তাই আজ সাহস করে ফোনটা করেই ফেল্লাম।কেমন আছো তুমি...? মানুষ বদলে যায় কিন্তু তাদের কণ্ঠ বদলায় না।আছি ভালোই আছি,নিজের মতো করে। নিজেকে সব সময় ব্যাস্ত রেখেছি।জিজ্ঞাসা করবে না আমি কেমন আছি?...প্রয়োজন নেই, কিছু মানুষ আছে যারা সবসময় ভালোই থাকে। তুমি হচ্ছো তাদের একজন। আমার কথা মনে পড়েনি তোমার?হ্যা পড়েছে অনেক মনে পড়েছে। যখন দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতাম তখন মনে পড়তো "তুমি ঠিক মতো খাচ্ছ তো?" যখন রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে, কেঁদে কেঁদে অসুস্থ হয়ে পড়তাম,তখন মনে পড়তো "তুমি সুস্থ আছো তো?" যখন আয়ানায় নিজের অযত্ন

অবহেলায় শুকিয়ে যাওয়া চেহারাটার দিকে তাকাতাম তখন মনে পড়তো " নিশ্চয় তুমি আরো সুন্দর হয়েছ।" একসময় অনেক মনে পড়েছে,এখন আর পড়ে না। এখন এতো সময় কৈ এইগুলো মনে পড়ার। আমাকে কী ক্ষমা করা যায় না? ক্ষমা তো আমি তোমাকে পাঁচ বছর আগেই করে দিয়েছিলাম। তোমায় ক্ষমা না করলে আমার মনে তোমার দেওয়া কষ্টগুলোর ক্ষত কোন ভাবেই শুকাতো না। আচ্ছা এখন তাহলে রাখি। এখন আমার আকাশ দেখার সময়।প্রতিদিন রাত্রে আমি এইসময় আকাশ দেখি। আকাশ কখনো আমার সঙ্গে ছলনা করে না। প্রতিরাত্রে সে তারার ঝুলি নিয়ে আমার সামনে হাজির হয়। আমি কথা বলি সে চুপচাপ শোনে, একটুও বিরক্ত হয় না... একরাত আকাশের সঙ্গে কথা না বললে হয় না, আমার কথা থেকে আকাশের কথা খুব বেশী জরুরী? আপাতত তাই। আমার চরম একাকিত্বের সময় এই আকাশ আমায় সঙ্গ দিয়েছে। যে পাঁচ বছর তুমি আমায় দূরে সরিয়ে রেখেছিলে,তার জন্য আমি আমার পাঁচ বছরের পাশে থাকা সঙ্গীকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবো না। আচ্ছা আমি এখন যাবো, রাতের আকাশ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ফোনটা কেটে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আকাশের বুকে আজ গোল চাঁদ উঠেছে। তাকিয়ে আছি,খুব কষ্ট হচ্ছে, সেই পাঁচ বছর আগের মতো কষ্ট; যখন সে আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কী দোষ ছিল আমার, কেন চলে গিয়েছিল আজও তা আমি জানিনা। তারপর অটুট বিশ্বাস আর আশা ধরে রেখেছিলাম একদিন তুমি আসবে, আমি অপেক্ষা করবো। করেছি অনেক অপেক্ষা করছি। ভেবেছিলাম যেদিন তোমার ফোন আসবে খুশিতে চিৎকার করবো, তোমার কাছে ছুটে চলে যাবো। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায় কিন্তু তুমি আসো না। বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা দুই

বছর হয়ে গেল। বাবা আমাকে অনেক ভালোবাসেন, কারণ খুব কম বয়সে আমি আমার মা কে হারায়। সেই বাবাকে পযন্ত বলে দিয়েছিলাম বিয়ে করবো না।বাবার দীর্ঘশ্বাস, দুঃখ ভারাক্রান্ত মন সবাই উপেক্ষা করতাম।ঠিক মাস কয়েক আগে বাবা অনেক অসুস্থ হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন মাইনর এট্যাক, যা এই বয়সে ওনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বাবার অসুস্থতার জন্য কোন না কোন ভাবে আমি দায়ী ছিলাম।কারণ বাবার সব চিন্তা ছিল আমাকে নিয়ে।বেশ কয়েকদিন পর বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,"আমার জীবনে মনে হয় খুব বেশি দিন বাকী নেই। আমি সব সময় তোমাকে সুখী রাখতে চেয়েছি। মৃত্যুর আগেও তোমাকে সুখী দেখতে চাই। এইটাই আমার শেষ ইচ্ছে।" একজন বাবা হিসেবে এর বেশি আর কিইবা চাওয়ার থাকতে পারে। তাই নিরুপায় হয়ে বাবার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করতে হলো। এখন আর নিজের ভালোবাসা নয়, তাদের ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার পালা যারা আমাকে তোমার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবেসেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। মনে মনে বললাম ভালোবাসা তোমায় দিলাম বিদায়।

সুশান্ত

মিসবাহুল হোসেন

সুশান্ত, আমার সহপাঠী, সবার থেকে নিজেকে দূরে রাখতেই চেষ্টা করতো সবসময়। ক্লাসরুমে এক কোনায় বসতো রোজই। শান্ত স্বভাবের, চোখে বড় ফ্রেমের চশমা লাগানো, বড্ড খ্যাপাতাম হ্যাবলাকান্ত বলে । কোনো উত্তর দিতো না , চুপচাপ সেখান থেকে সরে যেত । ক্লাসে মনোযোগ থাকতো সারাক্ষন, বই ঘাটতো,কি যেন খুঁজতে থাকতো, ব্যস্ত হয়ে উঠতো কিছু একটা ভেবে ,অস্থিরতা ওর চোখে মুখে স্পষ্ট প্রকাশ পেত।

আমরা তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, স্বভাবতই ,চঞ্চলতা ,দুস্টুমি এগুলো আমাদের সকলের মধ্যেই ছিল ভীষনরকম। হৈ হুল্লোড় ,খেলার মাঠ, টিফিন পিরিয়ড এ রমেন কাকুর ঝালমুড়ি, রথীন কাকুর ফুচকার লাইনে ।

সুশান্ত সেসবে সময় নষ্ট করতো না , মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে যেত ,তবে বেশীরভাগ দিন চুপচাপ বসে থেকে কাটিয়ে দিতো।

পরিমিত কথা বলতো, ঠিক যতটা প্রয়োজন । সবার সঙ্গে না মিশলেও, কোনোদিন কারো সঙ্গে খারাপ আচরণ করেনি, প্রতিবাদ করেনি, বা কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও দেখিনি । এসবের জন্যই হয়তো ওর প্রতি সবার একটা পরোক্ষ দৃষ্টি থেকেই যেত বা বলা যেতে পারে প্রচ্ছন্ন আবেগ ।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ, প্রায় একমাস পরে স্কুলে খুলেছে ,সবাই নিজের নিজের জমে থাকা গল্পে মজেছে, আড্ডায় মশগুল । কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো, সুশান্ত স্কুলে আসেনি।

একটু অবাক লাগলেও, ভাবলাম কোনো অসুবিধা থাকতে পারে হয়তো ।

প্রায় এক সপ্তাহ, হয়ে গেলেও সুশান্ত একদিন ও স্কুল আসেনি । আমরা প্রতিদিন খিল্লি করতে পারছিনা ভেবে মনে করতাম ওকে,

কিন্তু এখন সত্যিই চিন্তা হচ্ছে, এমনটা তো আগে কখনও হয়নি।

বড় কিছু হয়নি তো?

আরো দু-তিনদিন পরে শনিবার এর দিন, আমি ও আরো তিনজন বন্ধু মিলে ওর বাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা দিলাম ।

সেভাবে চিনতাম না ঠিকানা,ওর পাশের গ্রামের একজনকে সঙ্গে নিয়ে উঠলাম সুশান্তের বাড়িতে ।

সেখানে গিয়ে যেটা জানলাম, তাতে আমরা রীতিমত হতবাক, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম ।

সুশান্তর খোঁজে আমরা গেছি, শুনে একজন মধ্যবয়স্ক লোক যার মাথায় টাক, বড় গোঁফ, শরীরে কোনো বস্ত্রনেই, এসে বললো এখানে সুশান্ত বলে কেউ থাকেনা, তোমরা কেন এসেছো এখানে ?

লোকটার আচরণ কেমন যেন সন্দেহজনক, পাশের গ্রামের ছেলেটা জোর গলায় বলে উঠলো, এটাই তো সুশান্তের বাড়ি, আমি একদিন বই দিতে

এসেছিলাম ওকে ।

লোকটা মেজাজ হারালো, এবং আমাদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলো সেখান থেকে।

আমাদের এই কথোপকথন একজন বয়স্ক মহিলা শুনছিল একটু দূর থেকে।

আমরা নিরাশ এবং চিন্তিত হয়ে ফিরে আসছিলাম, একটু দূরেই মহিলাটা আমাদের ডাকলো, এবং জানতে চাইলো কি হয়েছে?

আমরা সুশান্তের কথা বলতেই ,মেয়েটার চোখ ছলছল করে উঠলো, কাঁপা ঠোঁটে বলে উঠলো ওহ!

একটু আড়ালে ওর বাড়িতে নিয়ে গেল আমাদের, তারপর বলতে শুরু করলো . সুশান্ত একজন অনাথ, ওর বাবা মায়ের পরিচয় কেউ জানেনা, ও নিজেও না । একদিন রাস্তার পাশে এক ডোবা থেকে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিল অনিন্দ্য দাস । অনিন্দ্য এই পাড়ার একজন খুব ভালো মানুষ, ওর নিজের একটাই মেয়ে। প্রথমে ওর স্ত্রী ব্যাপারটা না মেনে নিলেও, পরে খুশিই হয়েছিল।

বাঁধ সাধলো অনিন্দ্যের পরিবার, ওদের যৌথ সংসার, বাবা ,মা দুই ভাই ও তাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে একত্রে বাস করতো।

অনিন্দ্য বাবু জোর করেই রেখেছিল, নিজের ছেলের পরিচয়ে। সুশান্ত শারীরিক ভাবে একটু দুর্বল,হয়তো জন্মের সময় কোনো আঘাত পেয়েছিল। কিছুদিন পরে অনিন্দ্য সাপের কামড়ে মারা যায়।

তখন সুশান্তের বয়স ৮ বছর। ওর বাবার মৃত্যুর পরেই বাড়ির অবস্থা খারাপ হতে থাকে, ওর মা চেষ্টা করলেও গোপন রাখতে পারেনি তার জন্ম পরিচয় এর কথা, পরিবারের সকলের কথা শুনতে শুনতে, তাচ্ছিল্য, ভর্ৎসনায় ছেলে টা কেমন চুপসে গেল, নিজেকে গুটিয়ে নিলো সবার থেকে। কারো সঙ্গে মিশতো না। ওর মায়ের উপর ও অত্যাচার বাড়তে থাকলো। চোখের সামনে এগুলো দেখতে হতো ওই ছোট্ট ছেলেটাকে। ও চলে যেতে চেয়েছিল এখান থেকে, কিন্তু মা আর দিদির ভালোবাসা আর জেদে ছেড়ে যেতে পারেনি।

ওর মায়ের ইচ্ছে ছিল পড়াশুনা করে ভালো কিছু হতে হবে, তাই এত অশান্তির মধ্যেও পড়া চালিয়ে যাচ্ছিল ।কিন্তু শেষ রক্ষা হলোনা, নিজের চোখের সামনে মায়ের শরীরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনটা সহ্য করতে পারলো না।

দিদির শরীরে নিজের কাকার ছোবলের দাগ রক্তাক্ত করে তুলেছিল ছেলেটার হৃদয়।

চিৎকার করে সব যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল হয়তো,ভগবান সেই ইচ্ছাটাও পূরণ করলো না। বলতে বলতে মহিলাটা চোখের জল মুছতে মুছতে ,বললো, সুশান্ত এখন মেন্টাল হসপিটাল বন্দি।

বিস্মিত হলাম, নিষ্ঠুরতার নির্মম পরিণতি আমাদের বিচলিত করে তুললো।

সুশান্তের সব কিছু এড়িয়ে যাওয়ার কারণ গুলো স্পষ্ট হতেই নিজেকে কেমন অপরাধী লাগতে শুরু করলো। সুশান্তকে বলা প্রতিটা কথা প্রত্যাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে .....

কার্ডিয়াক এম্বুলেন্স

মুজাহিদুল হক

এই তো কিছুদিন পর সেমিস্টার পরীক্ষা, রনি বই নিয়ে বসে, কিন্তু কিছুতেই পড়াশোনায় মন বসাতে পারছে না। না, সব কিছু ঝেড়ে ফেলে আবার মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা , আবার ও ব্যর্থ। সে যেন কোনো এক গভীর ভাবনাই ডুবে আছে । পুরোনো স্মৃতি গুলো যেন তাকে কুরেকুরে খাচ্ছে। মনে পড়ে যায় , তার দাদুর কথা, সেই ছোটবেলায় যখন তাকে A ,B ,C, D ,,ক ,খ ,গ শেখাত , আর শোনাত বাঘ ও সিংহের গল্প , ভগত সিং, বিদ্যাসাগর , প্রীতিলতার গল্প । পড়া টাকে আকর্ষণীয় করে তোলা এটা দাদুর চিরকালের অভ্যেস । তখন হয়তো 2003 সাল হবে , A, B, C,D আর কয়েকটা কবিতা মুখুস্ত করে বুক ফুলিয়ে দাদুর cycle এ চেপে দাদুর স্কুলে যাওয়ার মজাই আলাদা ছিল, স্যার রাও স্নেহ করতো খুব। 2004 সালে দাদু retired করলেন , ইচ্ছা না থাকলেও বাড়ির কাছে প্রাইমারি স্কুলে তাকে ভর্তি করা হলো , তারপর হাই স্কুল , আর এই ভাবে চলতে চলতে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে আসলো । রেজাল্ট এর জন্য সবাই একটু উত্তেজিত ছিল, তবে দাদু যেন একটু বেশি। অবশ্য রেজাল্ট ও একটু ভালোই হয়েছিলো গ্রামের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল সে । আনন্দে দাদু আশেপাশে সবাই কে মিষ্টি মুখ করাতে লাগলেন। রনির মনে পড়ে যায় দাদুর একটা আশা " রনি , জানিস আমার বাবা মাস্টার ছিলেন , আমি মাস্টার , তোর বাবা মাস্টার , তোকেও কিছু একটা করতেই হবে ,

ফ্যামিলির ট্রেন্ড টা কে বজায় রাখতে হবে রে " , যেন কিছুটা হলেও পুরণ করতে চলেছে সে । এরপরে তাকে ভর্তি করা হলো আল আমীন মিশন এ কলকাতায়। সবসময় ছুটি মিলতো না, অনেকদিন পর পর বাড়ি আসতো। বাড়ি আসার খবর শুনলে বাবা , মায়ের পাশাপাশি দাদুর যেন আনন্দ আর ধরে না । মাঝেমাঝে বাড়ি পৌঁছাতে রাত হতো , দাদু তখন ও ঘুমাইনি , কোনো এক অজ্ঞাত টানে রনির জন্য যেন তিনি পথ চেয়ে বসে থাকতেন । রনি ও সেই রকম এ বাড়ি এসে প্রথমে দাদুর সঙ্গে দেখা করত, দাদুর সঙ্গে গল্প করতে তার খুব ভালো লাগতো , সে কত রকমের গল্প। দাদু- নাতির আড্ডাটা তাদের এভাবেই চলতো। ছুটি শেষ , আবার মিশন , আবার পড়াশোনা। 2018 সাল, রনি NEET পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। দাদুর যেন খুশি আর ধরে না, গর্বে ফুটে উঠছে বুকটা, বাড়িতেও আনন্দের সীমা নেই, এবার মনে হয় দাদুর কথা গুলো সে যথাযত ভাবে পালন করতে পেরেছে। সে ডাক্তারিতে ভর্তির সুযোগ পেল কলকাতার পিজি হসপিটালে , তার মনে পড়ে যায় কলেজের ভর্তির fees তার দাদু ই দিয়েছিলো। রনিকে নিয়ে দাদুর যতটা গর্ব হত ঠিক দাদু কে নিয়ে রনির ও গর্ব কম ছিল না। বাড়ি আসার পরেই দাদু-নাতির মধ্যে শুরু হতো কলেজের নানান রকমের পড়াশোনার কথা , মানব দেহ disection এর ছবি , আর সঙ্গে দাদুর উৎসাহ।

রনির সবে মাত্র দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয়েছে । দিন টা ছিল 25th nov , 2019 , প্রত্যেক দিনের মতো আজ ও ক্লাস করে মাঠে খেলাধুলার পর সন্ধ্যায় হোস্টেলের রুমে এসেছে । আজ যেন তার খুব ক্লান্তি

লাগছে , খেলাটা একটু বেশি হয়েছে বোধহয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নেট অন করে whattsapp খুলতেই বাবার ম্যাসেজ " আব্বা ভাল নাই , বহরমপুর পাঠালো , ডোমকল হসপিটাল থেকে "। রনি লাফ দিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে ফোন " কি হইছে দাদুর??" । জানা গেল বিকালের দিকে দাদুর বুকে প্রচন্ড ব্যাথা হচ্চিলো আর ক্রমশ অজ্ঞান হয়ে আসছিল । সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী ডোমকল মহকুমা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় , ওরা ECG করে বলে AV Nodal Heart block হয়েছে, বহরমপুর হসপিটালে ট্রান্সফার করতে হবে । দাদুর অবস্থা এখন খুব খারাপের দিকে, কোনো কথাই বলছে না । রনি সঙ্গে সঙ্গে তার বহরমপুর মেডিকেল কলেজের বন্ধুদের ফোন করে একটু সাহায্য করতে বললো । রাত্রের দিকে দাদুকে ভর্তি করা হলো বহরমপুর হসপিটালে (মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল)। বারবার রনি বাড়িতে ফোন করে , বারবার দাদুর খোঁজ নেই। অবস্থার কোনো উন্নতি নেই , ফিব্রিল pulse পাওয়া যায়। দূরে থেকে রনির মন মানতে চাই না, কিছু ভালো লাগছে না তার , ফোন হাতে নিয়ে বসে আছে , কত বার যে বাড়িতে ফোন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। হোস্টেলে আর ভালো লাগছে না তার , রাত সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরে সকালে সে চলে আসলো বহরমপুর মেডিকেল কলেজ। হোস্টেলে কিছুক্ষন থাকার পর সকালবেলায় বাবার সঙ্গে যায় main বিল্ডিং , 2nd ফ্লোর , মেডিসিন ওয়ার্ড । একটা বেডে দাদু শুয়ে আছে, সেজো কাকু সারারাত নির্ঘুম চোখে দাদুর পাশেই টুলে বসে ছিল। আজ এই প্রথমবার প্রানপ্রিয় নাতি আসার পরও দাদু শুয়ে আছে , আজ জিজ্ঞেস করতে পারছে না ...কি রে রনি কেমন আছিস ? কখন আসলি ? মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো আছে , চোখ কখনো বন্ধ

কখনো খোলা , কথা বলার ব্যার্থ প্রচেষ্টা , বুকের পাঁজর শুধু উঠছে আর নামছে, অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে । আগের দিন ICU তে বেড ফাঁকা ছিল না বলেই দাদুকে মেডিসিন ওয়ার্ড এ রাখা হয়েছিলো , কিন্তু আজ ICU তে বেড ফাঁকা হয়েছে, দুপুরে দাদুকে ICU তে ট্রান্সফার করা হলো , একদিন ওখানেই ছিল , অবস্থার কোনো উন্নতি নেই ঘন্টা দুয়েক পর পর Heart Rate কমে আসছে , ইনজেকশন দিয়ে আবার বাড়ানো হচ্ছে । ডাক্তার বলে দিয়েছে পেসমেকার বসাতে হবে আর এখানে তা হয় না , কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে । তারা এটাও বলেছে রোগীর অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক হয়ত কলকাতা নিয়ে যেতে পারবেন না। এই দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে খুব নিরুপায় হয়ে পড়েছে তারা , না পারছে এখানে সঠিক চিকিৎসা দিতে আর না পারছে কলকাতায় নিয়ে যেতে। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। অবশেষে ,27 তারিক সকালবেলায় ঈশ্বরের ওপর ভর করে কোনো এক ফলপ্রসূ আশায় তারা রওনা দিলো কলকাতার পথে। প্রায় নিভে যাওয়া বাতির ক্ষীণ আলো টুকু নিয়ে যাত্রা শুরু, রনি ও তার চার কাকু , বেড এ দাদু এবং কার্ডিয়াক এম্বুলেন্স। বহরমপুর হসপিটাল থেকে ছাড়ার সময় কিছু ইনজেকশন(আট্রপিন) সঙ্গে দিয়েছিল । পথিমধ্যে বারবার Heart rate নেমে যাচ্ছে , আর তখন এ ইনজেকশন দেয়া হচ্ছে। হু হু করে এম্বুলেন্স ছুটে চলেছে , কানে আসছে সাইরেনের শব্দ , আর মনে একটুখানি আশা , ক্ষীণ আলো টিকে প্রজ্জলিত করার প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা। নদিয়ার কৃষ্ণনগর পার হবার পর দাদুর অবস্থা আরও ক্রিটিক্যাল হয়ে উঠলো , বাধ্য হয়ে নিয়ে যাওয়া হল কল্যাণীর গান্ধী মেমোরিয়াল হসপিটালে , সেখানে কোন চিকিৎসায় হলো না , নিরুপায় হয়ে, একবুক আশা নিয়ে

আবার কলকাতার পথে চলল। কলকাতার পিজি হসপিটাল পৌঁছাতে বিকেল হয়ে গেল ।

উফফ , এখন অনেকটা স্বস্তি লাগছে , রনি তার নিজের কলেজ & হসপিটালে তার প্রানপ্রিয় দাদুকে নিয়ে আসতে পেরেছে , যেহেতু সে এই কলেজের ই ছাত্র, তাই সবই পরিচিত তার কাছে । এবার মনে হয় সে তার পরিবারকে আশার আলো দেখাতে পারবে, কিন্তু আবার ভয় ও হয় যদি .... না , সে আর ভাবতে পারছে না । দাদুকে নিয়ে এম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে কার্ডিওলজি বিল্ডিঙের গেটের সামনে । দাদুর মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো , চোখ বন্ধ , কোনো কথা নেই , শুধু বুকের পাঁজর একবার উঠছে আবার নামছে । এম্বুলেন্স থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে রনির চার কাকু , কিংকর্তব্যবিমূঢ় তারাও , অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে তারা রনির দিকে। রনি তার একটা বন্ধুকে বলে আগে থেকেই ইমার্জেন্সি টিকিট করেছিল , সেখানে শুধু ' Refer to Cardiology ' লিখে ছুটে গেল কার্ডিওলজি বিভাগে । কর্তব্যরত ডাক্তারকে সমস্ত কিছু খুলে বলা হল , দেখানো হলো কয়েকদিন আগের ECG , কিন্তু হায় , কোনো বেড ফাঁকা নেই । তার সেই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে সম্পূর্ণ ওয়ার্ড ঘুরে দেখলো , না সত্যিই কোনো বেড ফাঁকা নেই । কি হবে এবার , তার সামনে পুরো অন্ধকার , সব তার কাছে পরিচিত হওয়ার পরেও আজ যেন সে নিরুপায়। এদিকে এম্বুলেন্সের ড্রাইভার তাগাদা দিচ্ছে , সিলিন্ডার এ অক্সিজেন বেশি নেই, হয়তো আর কিছুক্ষণ চলবে , আর ভর্তি না করতে পারলে অক্সিজেন পাওয়াও যাবে না । না , কিছুতো একটা করতেই হবে , একবার ভাবলো সিনিয়র দাদা দের

বলে যদি কিছু ব্যাবস্থা করা যায় । যেমন ভাবা তেমন কাজ , সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলো তার পরিচিত এক জুনিয়র ডাক্তার দাদাকে , তিনি তখন চক্ষু বিভাগে কর্তব্যরত ছিলেন , দুই মিনিটের মধ্যেই দাদা এসে পড়ল। দাদার সঙ্গে রনি আবার চললো কার্ডিওলজি বিভাগে , কিন্তু সিট তো নেই তো কিভাবে ভর্তি করা হবে , না ভর্তি করা গেল না । দাদার পরামর্শে , দাদাকে নিয়ে রনি ছুটে চললো মেডিসিনে ওয়ার্ড এ , সঠিক চিকিৎসা নাহলেও অন্তত ভর্তি করে প্রাণে বাঁচানো যাবে , অক্সিজেন দেওয়া যাবে ,দু একদিন পর যখন কার্ডিওলজি তে বেড ফাঁকা হবে তখন নাহয় সেখানে ট্রান্সফার করে নেবে। কিন্তু ভাগ্য যেন আজ তার সঙ্গ দিচ্ছে না , মেডিসিন ওয়ার্ডে ও কোনো বেড ফাঁকা নেই । চললো surgery ওয়ার্ড এ, না সেখানেও কোনো বেড ফাঁকা নেই। এরপর Emergency Observation Ward (EOW), সেখানে দুটো বেড ফাঁকা থাকলেও তারা কোনোভাবে দিতে চাইলো না ,এটা নাকি কোনো পার্টির নেতা কিছুক্ষন আগেই সংরক্ষণ করে গিয়েছেন । দাদার duty আছে , দাদাকে চলে যেতে হলো । দাদুকে ভর্তি করার আর কোনো উপায় তার কাছে নেই , সব দিক থেকে চেষ্টা করেছে সে । কাকুদের কি জবাব দেবে সে ... যার উপর কিনা ভরসা করে কলকাতায় আসা । এদিকে এম্বুলেন্সের ড্রাইভার আবার সতর্ক করলো, বললো বাকি অক্সিজেন টুকু হয়তো আর দশ বা খুব বেশি হলে পনেরো মিনিট চলবে। তারপর কি হবে......... ভাবতেই বুকের ভেতরটা চড়াৎ করে উঠলো । আবার চেষ্টা , একটা বন্ধুকে নিয়ে রনি ছুটে চললো হসপিটালের সুপার এর কাছে, অফিসে সুপার নেই কোনো এক মিটিং এ বেরিয়েছেন , আসতে সময় লাগবে । রনির মনে হচ্ছিল ঈশ্বর হয়তো তার উপর কোনো

এক অজানা পাপের প্রতিশোধ নিচ্ছেন । মন খারাপ , চোখে জল , অফিসের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে রনি ও তার বন্ধু । হটাৎ কলেজের মধ্যে ডিরেক্টর স্যারকে দেখা গেল , অমাবস্যার রাতে চাঁদ দেখার মতো মনে হলো তার। ডিরেক্টর স্যার হলেন কলেজে এবং হসপিটালের হেড । প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় ডিরেক্টর স্যার কে সব কিছু সংক্ষেপে বলা হলো । 1st ইয়ারে স্যারের ক্লাস করেছিল সে , স্যার স্টুডেন্টদের খুব ভালোবাসতেন , স্যার তাকে অনেক আশা দিলেন , এটা স্যারের বৈশিষ্ট্য , সবসময়ই ছাত্র দেরকে সাপোর্ট করে থাকেন । তিনি একটা চিঠি লিখে দিলেন , তাতে স্ট্যাম্প এবং সাইন করে তাকে দিয়ে দিলেন , বললেন EOW তে নিয়ে যেতে । EOW তে কর্তব্যরত ডাক্তারদের দেখাতেই তারা একটা বেডের ব্যবস্থা করে দিলেন । একটা বেড পাওয়া গেলো , male ward , বেড নং 19. তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে । এটা EOW ওয়ার্ড, এখানে শুধু ইমার্জেন্সি চিকিৎসা করা হয় , এখানে proper চিকিৎসা নাহলেও অক্সিজেন দিয়ে রাখা যাবে। বেড ফাঁকা হলে তবেই কার্ডিওলজি তে ট্রান্সফার করে নেবে। ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে একগাদা টেস্ট করতে দেওয়া হলো , সেই টেস্টের কাগজ ও স্যাম্পল গুলোকে রনি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিলো । দাদুর কাছে সবাইকে থাকতে দিচ্ছে না, কোনো একজন কে দাদুর কাছে সবসময় থাকতে হবে । কাকু রা পালাক্রমে এক একজন শায়িত দাদুর কাছে এসে বসছে আর বাকিরা বাইরে অপেক্ষা করছে । রনি ওখানকার ছাত্র হওয়ায় তাকে কেউ বাধা দিচ্ছে না, সে যখন ইচ্ছা দাদুর কাছে আসছে , ডাক্তার দাদা দের সঙ্গে আলোচনা করছে , অক্সিজেন মাস্ক টা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা বারবার খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে । সন্ধ্যার পর রনি একবার কার্ডিওলজি বিভাগে গেল , দাদুর

পেসমেকার লাগানোর এর ব্যাপারে ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করতে । যোগা ল্যাবে কয়েক জন ডাক্তার কর্তব্যরত ছিল , তারা রাজি হয়ে গেল , বললো তুই কিছুক্ষন পর রোগীকে নিয়ে আই , আমরা Temporary Pacemaker (TPM) বসিয়ে দিচ্ছি , মনটা আনন্দে মেতে উঠলো তার। রনি জানতো TPM দিয়ে কোনো হার্ট ব্লক রোগীকে এক সপ্তাহ রাখা যায়, তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই অপেরেশন করে পার্মানেন্ট পেসমেকার বসিয়ে নিতে হবে। কিছুক্ষন পর রনি ও তার কাকু মিলে দাদুকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে চললো EOW থেকে cardiology ওয়ার্ড । অপেরেশন থিয়েটারে প্রবেশ করানো হল দাদুকে , বাইরে অপেক্ষারত কাকুরা । কিছুক্ষন পর দাদুকে বের করা হলো , TPM বসানো হয়ে গেছে , দাদুকে আবার নিয়ে আসা হলো EOW ওয়ার্ড এ, না এর পরেও অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। এই সব করতে করতে কখন যে রাত 9 টা বেজে গিয়েছে তার খেয়াল নেই । এতক্ষনে তাদের মনে পড়লো যে তাদের আজ কিছুই খাওয়া দাওয়া হয়নি , সেই সকালে বহরমপুর থেকে বেরিয়েছে , এখন রাত 9 টা বাজে , খাওয়ার কথা তাদের মনেই ছিল না , খিদে যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো। খিদে এখন ও নেই , কিন্তু খেতে তো হবেই , সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি যে । অনেক রাত হয়েছে , একটু বিশ্রাম দরকার । রাত কেটে গেল , সকাল হয়ে গেল , দাদুর কোনো পরিবর্তন নেই, যেমন ছিল তেমনি আছে । কর্তব্যরত ডাক্তাররা বারবার ইনজেকশনের সূচ ফোটাচ্ছে , কখনো ঔষধ দিচ্ছে আবার কখনো বিভিন্ন টেস্টের জন্য রক্ত নিচ্ছে , আর স্যালাইন তো সবসময় চলছে । সকাল 9 টা বেজে গেছে , রনি আবার ছুটলো কার্ডিওলজি On Duty ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলো , না বেড ফাঁকা নেই।

দুপুরের দিকে দাদুর প্রচন্ড জ্বর আসলো , ডাক্তার আসলো ঠিক বুঝতে পারলো না যে কি কারণে জ্বর হয়েছে , রক্ত পরীক্ষা করতে হবে । আবার ইনজেকশনের সূচ ফোটানো হলো হাতের শিরা তে (cubital vein) , কিন্তু শিরা দেখতে না পাওয়ায় কোনো রক্ত বেরুলো না , আবার ফোটানো হল , না, এবারও রক্ত বেরুলো না, চার বার পরপর ফোটানো হলো , প্রত্যেকবারই বিফল । দাদু নিথর হয়ে শুয়ে থাকলে ও যখন ইনজেকশনের সূচ ফোটানো হচ্চিলো তখন যেন ভিতর থেকে চিৎকার করে উঠছে , হাত - পা ছুড়ছে , যেন বলতে চাইছে ' আমার খুব কষ্ট হচ্ছে ' । চার বার চেষ্টা করেও হাতের শিরা থেকে যখন কোন রক্ত বের করতে পারলো না , তখন তিনি পায়ের শিরা (femoral vein) থেকে রক্ত নেয়ার চেষ্টা করলেন । এখানেও একই দৃশ্য , তিন বার ইনজেকশনের পরেও কোন রক্ত নিতে পারলেন না । দাদু কোনো কথা বলতে পারছে না , কিন্তু যতবার সূচ ফোটানো হচ্চিলো , ততবার তিনি জোরে জোরে হাত - পা ছুড়ছিলেন । কিছুক্ষন পরে অন্য এক ডাক্তার এসে রক্ত নিলেন ,অনেকটা রক্ত নিলেন , তারপর অনেকগুলি টেস্ট করতে দিলেন। রনি সেগুলো সব নির্দিষ্ট স্থানে জমা দিয়ে এল। দুপুর হয়ে গেছে , লাঞ্চের জন্য বাবা ও এক কাকু কে নিজের হোস্টেলের রুমে নিয়ে এল রনি ,বাকি দুই কাকু দাদুর কাছে থাকলেন, ইনাদের লাঞ্চ হয়ে গেলে ইনারা আবার দাদুর কাছে যাবেন আর বাকিরা তখন লাঞ্চ করতে আসবেন । রনি হোস্টেলে তাদের জন্য লাঞ্চের ব্যাবস্থা করেছিল , তারা ফ্রেস হয়ে খেতে বসে পড়লো । হসপিটাল থেকে ছোট কাকু ফোন করছে রনিকে , "তাড়াতাড়ি আই একবার " । কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে হয়তো , রনি ও তার বাবা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ

করে চললো হসপিটালে । তারা গিয়ে দেখে ছোটকাকু বাইরে দাঁড়িয়ে , ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, তাদেরকে দেখে আর কান্না ধরে রাখতে পারল না। রনিরা ছুটে গেল দাদুর কাছে , দাদুর শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গিয়েছে ,একজন ডাক্তার তার দুই হাত দিয়ে দাদুর বুকের ওপর অনবরত চাপ (press) দিয়ে চলেছে। রনি দাদুর হাত ধরে দেখলো কোনো pulse নেই । ডাক্তার দাদাটি অনেক্ষন ধরে চেষ্টা করলো , আর রনি দাদুর হাত (Radial Artery) ধরে দাঁড়িয়ে , কোনো pulse পাওয়া গেল না , ততক্ষনে রনির চার কাকু দাদুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে । সময়টা ছিল 28th Nov, 3:40pm ডাক্তার ঘোষণা করে দিলো " He is dead " সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠলো, বিদ্যুৎ চমকানোর মতোই চমকে গেল সে । প্রশ্বাস নিতে যেন খুবই কষ্ট হচ্ছে তার । সামনে বেডে দাদুর নিথর দেহ পড়ে আছে , যেন সে ভাবতেই পারছে না । সমস্ত ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে তিনি চলে গেলেন এক অজানা গন্তব্যে । কত আশা নিয়ে নিজের কলেজে নিয়ে এসেছিল দাদুকে..... তার চেষ্টার তো কোনো ত্রুটি ছিল না.....তবুও কেন ভাগ্য তার সঙ্গ দিল না ....কত ভালোবাসতো সে তার দাদুকে ...

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে , সে টেরই পাইনি । সে চমকে উঠলো এক বন্ধুর ডাকে ' কি রে কাঁদছিস কেন ??' হটাৎ প্রশ্নে তার অপ্রস্তুত জবাব ' কই না তো '। সবার চক্ষুর আড়ালে চোখের জল মুছে রনি বই এর পাতাটি উল্টালো , সামনে পরীক্ষা আছে পড়তে হবে তো ।

অবলম্বন

রাজ আলী

দিনটি ছিল বৃষ্টির। সকাল থেকে ঘন ঘন বৃষ্টি লেগেয় আছে। পাশের পানা পুকুরটা যেন জলে থই - থই করছে। নাড়ু গোপাল হাঁক দিয়ে বলেন, সে জমিতে যাচ্ছে। জল কাটাতে। ধানের জমি, এই জমির উপর ভিত্তি করে চলে যায় তার সংসারটি। সংসারে তারা দুটি মানুষ সে এবং তার একটি মাত্র কন্যা কল্যাণী। পাশের সুরু গলিটা দিয়ে নাড়ু গোপাল কাকা বেরিয়ে গেলো। সে আমার প্রতিবেশী হলেও আমার সমস্ত কাজে হাত বাড়িয়ে, বাবা - মারা যাবার পর সে অবশ্য আমার সমস্ত জমি দেখাশোনা করে। আর মা তো সেই ছোটবেলাতেই!

আমি গোপিনাথপুরু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছি গত তিন বছর আগে।

পাশের ঘরে তখন তীব্র-বেগে শা শা শব্দ হচ্ছে, বুঝলাম চায়ের জল গরম হচ্ছে। ভূলেই গিয়েছি! গিয়ে দুধ আর চা পাতা দিয়।

তারপর প্রথম চুমুক লাগাতেই বৃষ্টির ধারা আরো তীব্রবেগ নিলো। হঠাৎ একটা বাজ পড়লো, এমন মনে হলো যেন বাড়ির আশেপাশে পড়েছে।

তারপর বিছানায় গিয়ে গীতাঞ্জলির 102 নং পৃষ্ঠাটা পড়তে পড়তে হঠাৎ গভীর ঘুমে ঢলে পড়ি।

ঘুম ভাঙে মহেশ নামে আমার এক প্রতিবেশীর তীব্র কণ্ঠস্বরে। এত ডাকাডাকির কারন জিজ্ঞেসা করার আগেই দরজার বাইরে কল্যানীর অবসন্য চেহারা। তারপর কোথাথেকে যেন একটা ক্ষীণ শব্দ এলো - নাড়ু গোপাল কাকা আর নেই রে? কথাটা কানে আসতেই বারবার যেন কল্যানীর অবসন্য চেহারাটা মনের মাঝে ভাসতে থাকলো।

চোখের কোনে অশ্রুধারা বয়ে এলো, বুকের মধ্যে যেন কেউ একটা ভর করে আছে।

আর থাকতে পারলাম না কালবৈশাখির মতো ফুপরে কেঁদে ফেললাম। বাবা মার যাবার পর এই নাড়ু গোপাল কাকাই আমাকে আগলে রেখেছিল।

কারন জিজ্ঞেস করতে

মহেশ বললো কিছুক্ষণ আগে বাজ পড়ে নাড়ু কাকা..............

আমি গিয়ে কল্যানীর পাশে দাঁড়ায়।যদিও আমি তাকে শান্তনা দেবার চেষ্টা করে ছিলাম।

কিন্তু কল্যানীর দুচোখের বরফ যেন গলে পডছে। আমিও তাকে অজথা কিছু বলতে চাইনা।

পরের দিন কাকার শেষ কাজ আমিই সম্প্রাদন করি।

আমার গ্রাম-বাংলায় পূর্বপুরুষ থেকে একটা রেওয়াজ চলে আসছে - অভাগি, পোড়ামুখো, মা-বাপ কে তো খেয়েছিস, এই সব নানান কথা শুনতে হয় গ্রাম বাংলার মেয়েদের।

নাড়ু কাকা মারা যাবার পর কল্যানী কিন্তু এর থেকে ব্যতিক্রম হয়নি। এই তো সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ঠাকুর জ্যাঠানি কল্যানীকে যা-ইচ্ছে তাই শুনিয়ে দিল। গুরুজন বলে কিছু বলতে পারলাম না, বললেই হযতো বলে ফেলবে বেশি শিখেগেছিস।

এখন কল্যানী আমার বাড়িতে কাজ-কম করে। ভাত রান্না, বাসন মাজা থেকে যাবতীয়।

নাড়ু কাকা বেঁচে থাকতে বলতেন তোর মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল কল্যানীর সঙ্গে তোর বিয়ে দিবে। কল্যানীও অবস্য ব্যাপারটা জানতো।

কল্যানী চা দিয়ে গেলো। ভাবলাম ওর সঙ্গে কিছু কথা বলবো। তাতে ওর ও ভালো লাগবে।

সারাটাদিন সে চুপ চাপ থাকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। দেখে যেন মনে হয় সে খুব কষ্টে আছে। এই পৃথিবীতে কেউ তো তার আর নেই। তাছাড়া কারো সঙ্গে যে কথা বলবে তাউ হযনা ।তাই ভাবলাম ওর সঙ্গে একটু গল্প করবো। ওকে ডাকতেই সে বলে - আসছি ছাদে আচার মেলে দেওয়া আছে তুলে আনিগে।

তারপর আর তার সঙ্গে কথা বলা হয়নি। কিছুদিন পরে বুঝতে পারি কল্যানী আমার মনের মধ্যে, কোন এক সবুজে ঘেরা গ্রামে, কলাপাতা দিয়ে ছাওযা কুড়ে ঘরের মতো জায়গা করে নিয়েছে। ভাবি কল্যানী কে বলবো

বলতে পারিনি। তাছাড়া মায়ের এবং নাড়ু কাকার তো ছোটো বেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল। কথাটি কল্যানীর অজানা নয়।

সকাল থেকে মাথাটা ধরেছিল। নাখে সমুদ্র, থামোমিটারটা বললো 101, খাবারেও তেমন রুচি ছিলনা, রাতে প্রচন্ড জর, দেখি কল্যানী মাথায় জলপটি দিচ্ছে। মেয়েটিও না বড্ড করুনামযি।

পরের দিকে ডাক্তার বাবু বললেন ডেঙ্গিতে পেয়েছে, শরীরের উপর যত্ন নিন। হেলায নেবেন না। তারপর কতদিন যে বিছানায় ছিলাম তা আর খেযাল নেই। হয়তো 20-22 দিন। কল্যানী খুব যত্ন করেছে।

পরের দিন স্কুল যেতেই হরীনাথ মজুমদার একটি আজি রাখলেন।

হরীনাথ মজুমদার হলেন আমার স্কুল এর প্রধান শিক্ষক। হরীনাথ বাবু বললেন আমি আর বেশি দিন নেই বাবা। বলো আমার কথায় না করবে না। কথাটা ফেলতে পারলাম না, আবেগের বশে বলে বসলাম না বলুন।

হরীনাথ বাবু বললেন আমার মেয়ে সুদীপ্তার হাত আমি তোমায দিতে চাই বাবা।

কথাটা শুনে আমি থ হযে গেলাম। কি করবো বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপর হরীনাথ বাবুর অসহায় মুখটি দেখে প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেললাম। হরীনাথ বাবু বললেন সমবার দিনটা খুব শুভ। বললাম ঠিক আছে।

বাড়িতে এসে কল্যানীকে কথাটা জানাতে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো, কোন উত্তর দিল না। বলল আমি আসছি জল আনতে হবে।তারপর আর কল্যানী সেই ভাবে আসে না!

শুধু রান্নাটা করে দিয়ে যায়।

সমবার সকাল থেকেই খুব তোরজোড, মহেশ চারিদিকটা বারবার দেখে নিতে থাকলো কোথাও কিছু খামতি আছে কি না। সকাল থেকে লোকজন, এর সমাবেশ ঘটতে থাকলো।

এত সমাবেশের মধ্যেও যেন কিছু একটা খামতি মনে হলো।

মহেশ কে ডেকে বললাম, যাতো দেখ গিয়ে কল্যানী কোথায়।

মহেশ এসে খবর দিল কল্যাণীকে তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

হতভম্ব হয়ে মহেশ কে বললাম তুই থাম আমি দেখে আসি।

গিয়ে দেখি ফাঁকা বাড়িটা যেন কান্না করছে, যেন সে তার মা কে হারিয়ে ফেলেছে।

গ্রামের প্রতিটি পাড়া, প্রতিটি গলি, পর্যন্ত হাঁক-ডাক করলাম কিন্তু প্রতিধ্বনি স্বরুপ আমার হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই ফিরে এলো না। অবশেষে গ্রামের শেষ প্রান্তে গিয়ে বসে পড়লাম। আকাশ তখন নীল থেকে নীল - কালোর দীকে এগোচ্ছে। টপ টপ করে বারি ধারা বযে এলো। মনে হলো আমি যেন স্রোত হীন সমুদ্রের মাঝে সাঁতার না জানা এক ক্ষীণ প্রাণ। যেন জলে হাবু-ডুবু খাচ্ছি। একদিকে আমার অপেক্ষা, আর অন্য দিকের প্রতিক্ষায় আমি। স্রোত হিন সমুদ্রের মাঝে আমি, যেন একটু স্রোত হলে বাঁচি।

প্রবন্ধ

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে?

...এক সাধারণ পাঠকের প্রশ্ন

গিয়াসুদ্দিন দালাল

সবার এ সৌভাগ্য হয়না।

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন লিখছেন আর এক কবি কোলরিজ তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন এ কবিতা সেই সময়ের সাহিত্য সৃস্টি থেকে কোথায় আলাদা। সাহিত্যের ইতিহাসে ঠিক কোন জায়গায় এ কবির স্থান হওয়া উচিত।

সৌভাগ্য তো দূরের কথা দূর্ভাগ্যই ছিল নজরুলের নিত্য সঙ্গী। যেমন বাস্তবে তেমনি সাহিত্যিক জীবনে।

নজরুল লিখে চলেছেন।

যারা লম্ফের আলোয় অভ্যস্থ তারা বিদ্যুতের আলোয় তো একটু চমকাবেই। আমরা জানি, সাহিত্যিক নজরুলের ক্ষেত্রে এই চমকানোটা একটু বেশিই ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যে ধূমকেতুর আবির্ভাবে যা হয় আরকি!

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন?

এর বিশ্লেষণ করার জন্য নজরুল কোন কোলরিজ পাননি সেই সময়।

এখন কোথাও অ্যাপাথি আর কোথাও পদ ও পুরষ্কারের ইঁদুর দৌড়!কোথাও তাঁর নামে টাকা সংগ্রহ করে হাতা-খুন্তির মেলা, তো কোথাও ডলারের ফ্যাসন প্যারেড!

বাংলা সাহিত্যের দুই ইতিহাসের কোনোটিতেও তাঁর মূল্যায়ন হয়েছে কি? কাব্যে গানে উপন্যাসে ছোটগল্পে তাঁর মৌলিকতা নিয়ে? কোথায় তিনি ঐতিহ্য অতিক্রম করে তৈরী করলেন নতুন পথ,নতুন ঐতিহ্য? জানলে উপকৃত হই।নজরুল বিশেষজ্ঞ গণ কি বলেন আমাদের মত সাধারণ পাঠক কে?

আমরা ট্র্যেডিশন ও ইনডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট তত্ত্বের আলোয় নজরুলের কবি মানস ও ভাষার উত্তরণের কথা বলছিলাম।

দুটি খুব সাধারণ পরিচিত গীতি কবিতার ভাষা ধরে এই বিষয়টির দিকে নজরুল গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যের ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বৃহত্তর আলোচনার পথ খুলে দিতে।

নজরুল এক জায়গায় লিখছেন, সে সময় বাংলা ভাষাকে সাহিত্যক্ষেত্রে আসতে হলে সংস্কৃতের টিকি, বিসর্গের চন্দন ফোটা ও যুক্তাক্ষরের নামাবলী পরে আসতে হত। অবশ্য এর আগে যেসব বৈষ্ণব কবি পদাবলী রচনা করে গেছেন তা আনন্দ বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন চির কিশোর পূর্ণপ্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের রূপই প্রকাশ করেছে।

এই “সংস্কৃত জহ্নুর জঙ্ঘা থেকে বাংলা ভাষার রসগঙ্গা রূপকে” উদ্ধার করাই হল ট্র্যাডিশনের উপর

দাঁড়িয়ে ইনডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট দিয়ে সাহিত্যে নতুন ধারা তৈরী করা। ভাষার দক্ষতা,সহজাত কাব্য প্রতিভা,সহজ ও সূক্ষ রসবোধ সম্মিলিত ভাবে নজরুল কবি মানসের উত্তরণ ঘটিয়েছে। সব ট্র্যাডিশন ছাপিয়ে গড়ে তুলেছে এক নতুন ঐতিহ্য, স্টাইল ও সাহিত্য ভাষা,নজরুল বললেই যা আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় তাই তার উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

নজরুল বিদ্রোহী এইখানে। এটা বুঝতে হবে।

ভাষা ও কবি মানসের মেল বন্ধনে কি সহজ যেন সেই কঠিন উত্তরণ নজরুল কাব্যে!আমরা অতি শিক্ষিত তাই তর্ক করি।নজরুল বিনয়ের সাথে সে অনুসরণের কথা লিখে গেছেন।যেমন সব প্রতিভাবান স্রষ্টাই করে থাকেন।তবেই না তাঁরা মোড় ঘোরাতে পারেন।

১| বিষয় প্রেম।ব্যবহৃত বাংলাভাষা সংস্কৃত ও পদাবলী প্রভাবিত।শুদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যে লেখা কীর্তনাঙ্গের এই রচনা যেন কবির নিজ ঐতিহ্যের চর্চা হিসেবেই নিবেদিত।

নওল শ্যাম তনু গোরীর পরশে গো/গলে পড়ে নবনীর প্রায়/কোমল শিরীষ ফুল ঝরিয়া পড়ে যেন/মৃদুল আলতো হাওয়ায়/দুঁহু তনু থরথর গরগর গরবে প্রেমরস আলসে/মাধবী শ্রী যেন লতা হয়ে জড়াল মাধবে লালসে/রাই শ্যাম জড়াল/পাষাণ শিলার বুকে বিগলিত হয়ে যেন চন্দন গড়াল।

কোলের হরিন ফেলে আকাশের চাঁদ নীল উপল নিল কোলে/হরিদ্রা রঙে হরি

অঙ্গ আদ্র হয়ে পীত-বসন রূপে দোলে/দোলে গো দোলে/প্রীতির রঙে পীত-বসন হয়ে হরি দোলে দোলে গো ....

২| বিষয় প্রেম।ব্যবহৃত ভাষা সহজ সরল রসপূর্ণ শুদ্ধ বাংলা। ভারতীয় ও মধ্যপ্রাচ্য অনুষঙ্গ ও মিশরের সুরসংযোগে এক নতুন ঐতিহ্যের পথ খুলে দেওয়া।পান্ডিত্যের গভীরতা ও প্রতিভার বিশালতা ছাড়া যে তা সম্ভব নয় একথা আমরা সবাই বুঝি কিন্তু কোথাও লিখিতভাবে বলতে চাইনি,চাই না।

কিন্তুএবার তা বলতে হবে।

শুকনো পাতার নূপুর পায়ে/নাচিছে ঘূর্ণী বায়/জল তরঙ্গের ঝিলমিল ঝিলমিল/ঢেও তুলে সে যায়। দিঘীর বুকে শতদল দলি/ঝরায়ে বকুলচাঁপার কলি/চঞ্চল ঝরনার জল ছলছলি/মাঠের পথে সে ধায়।

বনফুল আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া/আলুথালু এলো কেশ গগনে মেলিয়া/ পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া/ধুলি ধূসর গায়।

এরকম অজস্র রচনা আছে। যা নেই তা আমাদের দেখার চোখ!

বাংলা কাব্য সাহিত্যে ম্যাসকুলিনিটি ও মিশ্র ভাষা সংস্কৃতির প্রবক্তা নজরুলের প্রতিনিধিত্ব মূলক কবিতা নিয়ে অন্যত্র আলোচনার ইচ্ছে রইল।

নজরুল বাংলা সাহিত্যের প্রথম পলিটিক্যাল নভেলিস্ট ও প্রথম পত্র ঔপন্যাসিক।

তাঁর গদ্য সাহিত্য হল বাংলা সাহিত্যের প্রথম কম্যুনিটি লিটারেচার।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে গত ২০১৫ ডিসেম্বরে আমার এ আলোচনায় মৌখিক সহমত প্রকাশ করেন বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান।

এখন ডলারপুষ্ট নজরুল বিষেশজ্ঞদের কেউ যদি এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিত আলোচনা করেন তাহলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নতুন করে লিখিত হতে পারে, উপকৃত হতে পারে আমাদের মত নজরুল সাহিত্যের অতি সাধারণ পাঠকবর্গ।

এই বৈশিষ্ট্য মূলক নজরুল সাহিত্যকর্ম গুলি সহ সমগ্র নজরুল রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করে তা আন্তর্জাতিক পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার আমার একক,ঐকান্তিক ও অসহায় প্রয়াসের কথা আজ না হয় নাই বললাম!

সত্যই সত্য

বজলে মুর্শিদ

"তোমার এ জীবনে ঠকে গেলে আর কি ফিরে পাবে এমন জীবন।

সোনার জীবন গড়িতে হলে লাগবে সত্যের সাধন "

সত্য যখন হারায় দিনের অন্ধকারে -

মিথ্যাকেও সত্য বলে অবুঝ মন মানে যে নির্বিচারে ।

সত্য মিথ্যার লড়াইয়েই মানবজীবন। এ লড়াই ঘরে, বাইরে, অভ্যান্তরে। অন্তরের লড়াইয়ে জয় যুক্ত হলেই আত্মিক সুখের সঞ্চারিত আলো মহিরুহের ন্যায় বিকশিত হবে সর্বত্রে। পরাজিত হবে ঘরে বাইরের লড়াই। দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই চিরস্থায়ী সত্যের উদঘাটন হবে। শান্তির জগৎ ফুটে উঠবে মানব ক্রিয়াঙ্গনে।

মিথ্যা যখন মহা মিথ্যায় পরিনত হয় তখনই শান্তির দূত সত্যের বানী নিয়ে আসেন এ মহাবিশ্বালয়ে। হজরত মহাম্মদ (সাঃ) সত্যের প্রচার করেছিলেন আইয়ামে জাহেলিয়াতকে দূর করতে। মিথ্যার বিরুদ্ধেই চুড়ান্ত প্রতিবাদে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে বিশ্বময় আলো উৎসারিত হয়েছিল। নারীর অধিকার প্রতির্ষ্ঠিত হয়ে মানব সত্তার অভিন্নতা সারা বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেছিল। আজ যা স্বতঃ সত্য ।

স্বামীজী বলেছিলেন - " সত্যের জন্য সব কিছুকে হারানো যায়। কিন্তু

সবকিছুর জন্য সত্যকে হারানো যায়না "। পরমহংসদেব বলেছিলেন - রাতের অন্ধকারে ঝকঝকে তারা দেখা যায়। রাতের অবসানে আকাশের তারা নিস্প্রভ হয়। তাই বলে 'তারা' নাই বলা যায়না । অজ্ঞানতার কারনে যদি সত্যকে (ঈশ্বর) না দেখা যায় তাই বলে সত্য নাই বলা যায়না । ইউরোপের বিখ্যাত দার্শনিক রেণে দেকার্ত বলেছিলেন - " আমি চিন্তা করি - অতএব আমি আছি" সবকিছুকে সংশয় করা হলেও - সংশয়ের কর্তাকে কখনই সংশয় করা যায়না" কেননা কর্তা হীন সংশয় অসম্ভব। সেই কর্তাই আমি (সত্য)। আর আমি মানেই ঈশ্বর। বিজ্ঞান বলে Truth never dies, it must focus one day.

এই আপ্তবচন অবশ্যই স্বীকৃত সত্য। তাহলে এতো মিথ্যা কেন? প্রতিদিনের পাঠের সার সংক্ষেপ হওয়া বিছানায় যাওয়ার পূর্বেই বাঞ্চনীয়। ব্যাংকের হিসাব নিকাশ দিনের দিনেই অপরিহার্য। তেমনি জীবনচর্চায় গোটা দিনের হিসাব নিকাশ শোবার পরে ঘুমের পূর্বে অত্যাবশ্যক। প্রতিদিনের হিসাব যদি সত্যকে সম্মুখে রেখে প্রতিদিন নিরঘন্টের সীমানায় বাধতে পারি তাহলে মিথ্যা পরাভূত হবে। মুখ আর মুখোশ আয়নার সম্মুখে ধরা পড়বে। নিজের বিলাস ব্যাসনের জন্য হাহাকার করবেনা। কথা ও কাজের মধ্যে তফাৎ দেখলেই সমাজে সংকট সৃষ্টি হয়। মহাগ্রন্থ আল কোরান বলে - নিজে যা করোনা, অন্যকে তা বলোনা। এই অমোঘ বানী নিঝুম রাতে বিছানায় শুয়ে চর্চা করতে হবে। বাস্তব জীবন হবে তারই আনুকুল্যে। মিথ্যা হারিয়ে সত্যের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু আহা! সমাজ পরিচালনায় মোড়লের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে রাজনৈতিক মোড়ল কিংবা ধর্মীয় মোড়ল হতেই পারেন। এদের কথার সাথে কাজের প্রায়শই মিল দেখিনা। এর ফলে আত্মসংযম - আত্মনির্ভরতা হারিয়ে নিজেকে অবহেলিত মনে করে হতাশার আশ্রয়ে কেউ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দান করে। 'সমাজ' বেলাল্লাপনা সমাজে পরিনত হয়। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে, নৈতিক শিক্ষার অধপতনে সমাজ তলিয়ে যায় আরো আরো পশ্চাতে। মদের বোতলে পেট্রোল ঢুকিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চাই আমরা। আসলে কি তা সম্ভব ? বুদ্ধদেবের ভাষায় গগনচুম্বী না হয়ে অবনত মস্তিষ্কে নিম্নে অবলোকন শ্রেয়।

এইযে কোভিড ১৯ এ লকডাউন চলছে। ঘোষণা ২৪ শে মার্চ হঠাৎ সারা দেশে করা হলো। এটা সত্য। কিন্তু জনগনের কথা কি ভাবা হলো ?

লকডাউন চলছে, কিন্তু মানছে ক জন ? এটা সত্য । এর নেপথ্যে মিথ্যা কোথায় ? এই ভাবনা অবৈজ্ঞানিক ও অবান্তর।

লকডাউন চলছে, মদের দোকানও খুলছে। এটা সত্য। এর পশ্চাতের কারন কী ?

করোনা কোথায় ছিলো? কিভাবে এলো? প্লেনে আসা কয়েকটি বিমান বন্দরের লকডাউন করলেই সারা দেশের মানুষকে এ ভোগান্তি ভূগতে হোতনা। কিন্তু কেন হলোনা ?

নিজ ভূমে পরবাস। পরিযায়ী শ্রমিকদের আগেই নিজ রাজ্য ফিরালে কি এতো সংশয় হতো ? তবে এতো পরে ফেরানো হলো কেন ? এরা সবাই মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করে, মানুষের জন্য রাজনীতি করেনা। মিডিয়াগুলি প্রায়শই কোন না কোন মোড়লের কাছে মাথা বিক্রি করে, ফলে সত্যের স্থান কোথায় । এরা সারা দিনের কিংবা পাঁচবছরের এমন কি সমস্ত জীবনেরই হিসাব নিকাশ করেন না। মিথ্যার জোয়ারে গা ভাসিয়ে চলেন। যারা চলে গেছেন তারা আর ফিরে আসেন নি এই চর্চা থেকে আমরা আজকে ঢের ঢের দূরে। তাইতো এতো সমস্যা সমাজে। ৬২ শতাংশ পেয়ে কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি সাড়ে ৬১ শতাংশ পাওয়া ব্যক্তি থেকে অনেক দূরে। বাবা মা বন্ধু বান্ধব কে ছেড়ে দিয়ে অনেকেই বিশ্বায়নে নিজ আহলাদে আহলাদিত। বলে সময় নেই, দেখা করিনি তাই " ইত্যাদি । যাদের কাছ থেকে সমাজ সত্যের দাবিদার ছিলো, তারাই সত্যকে হরন করলো। তাই বলি "সবকিছুকে ফাঁকি দিলেও নিজের বিবেককে কখনো ফাঁকি দেওয়া যায়না । সুতরাং হজরত বেলালের একবারের তৌবাই যথেষ্ট ছিলো।

অন্যায় কখনো চাপা থাকেনা। বার্নাড শর ভাষায় - আমি দু চোখে সবাইকে দেখি কিন্তু বিশ্বের চোখ আমাকে দেখে। সত্যের প্রতি বিশ্বাসেই জগৎ চলে -

মিথ্যা চিরন্তন প্রবঞ্চক - ঠক প্রতারক। যে কারনে আমি আমি আজ জয়ী, সেই কারনটাই যেন আবার 'না' করে বসি। তাহলে ভবিষ্যতে হবে অতীব কঠোর। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হতে হবে সৎ একনিষ্ঠ। সবকিছুর উপরে সত্য প্রতিষ্ঠিত। জন্ম সত্য , মৃত্যু সত্য , মানুষ সত্য । এই ত্রিধারার সমন্বয়েই জগৎ। কঠিন সময়ের সম্মুখীনে মানুষ আজ মানুষের শত্রু। করোনা হলে নিজে বাঁচেনা, অন্যকেও বাঁচাইনা। অন্য অসুখে মানুষ মানুষের বন্ধু, কিন্তু আজকে কেউ কারো দায়িত্ব নেইনা। তাই লকডাউন ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলি। এ নিয়ম মেনে চলতেই হবে আমাদের। তাই সত্যকে মানো, সত্যের জয় করো ।

আল্লা বখশ সুমরো-- নাম তো নেহি শুনা হোগা ২ ?

সরফরাজ মল্লিক

হাত মে বিড়ি মু মে পান/লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান-- বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম লীগের এই স্লোগানকেই উপমহাদেশের মুসলমানদের সাধারণ অভীপ্সা বলে সাধারণীকরণের একটা প্রচেষ্টা অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও মুসলমান মাত্রই স্বাতন্ত্র্যবাদী-- এমন একটা একরৈখিক ইতিহাস এখনও সচল, কারণটা সম্ভবত প্রকৃত ইতিহাস নির্মাণের অভাব। প্রকৃত বাস্তবে অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের মতো মুসলমান সমাজও বহুধা বিভক্ত; এবং তা স্বাধীনতা সংগ্রামকালেও ছিল। দুঃখের বিষয় হলো, জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারায় মুসলিম লীগের পাশাপাশি যে বহু মুসলমান সংগঠন ও ব্যক্তি প্রকৃত বাস্তবেই জাতীয়তাবাদী ছিলেন তাদের কথা সাধারণ ইতিহাসে তেমন হবে উঠে আসে না। এমনই এক প্রকৃত দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী মুসলমান আল্লা বখশ সুমরোর কথা আমরা এখানে আলোচনা করবো ।

আল্লা বখশ সুমরো ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের বোম্বে প্রেসিডেন্সির (তখনও সিন্ধ প্রদেশ গঠিত হয়নি) শিকারপুর শহরে এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন উত্তর-সিন্ধের সুমরো গোষ্ঠীর একজন নেতা। তাঁদের পারিবারিক অনেক জমিজমা ও সরকারি সিভিল কন্ট্রাক্টারের

এর ব্যবসা ছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর তিনি তাঁর পিতার ব্যবসাতেই যোগ দেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সুক্কুর জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। পরে অবশ্য তিনি বোর্ডের সভাপতিও হন। তিন বছর পর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বোম্বাই আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

সিন্ধ প্রদেশ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসার পর ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বৃহৎ আয়তনের কারণে সিন্ধের প্রান্তিক মানুষদের কাছে প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছাচ্ছে না এই মর্মে সিন্ধকে বোম্বাই প্রদেশ থেকে পৃথক করার পূর্বতন আন্দোলন এইসময় জোরদার হয়ে উঠলে তিনি তাতে যোগদান করেন এবং আব্দুল মাজিদ সিন্ধির সঙ্গে তিনিও নেতৃত্ব দেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে শাহনওয়াজ ভুট্টোর সঙ্গে তিনি সিন্ধ পিপলস্ পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীকালে যা সিন্ধ ইউনাইটেড পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়ে একতা দল হিসাবেই পরিচিত হয়। এটি শুধু মুসলমানদের দল ছিল না, সিন্ধের সকল সম্প্রদায় ও সকল অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতো। এবং এই দলের প্রধান হিসেবেই তিনি দুবার প্রধানমন্ত্রী হন (তখন প্রদেশের প্রধানকে মুখ্যমন্ত্রী নয়, প্রধানমন্ত্রীই বলা হত)। এই ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝিই আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) স্থগিত হয়ে যায়। ফলে কংগ্রেস ভারতশাসন বিধি অনুযায়ী রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে থাকে। এদিকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ১লা এপ্রিল শেষমেশ সিন্ধ বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে

আলাদা হয়ে যায় এবং সিন্ধ প্রদেশের রাজনীতিতে আল্লা বখশ একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে নতুন শাসন আইন কার্যকর হয় এবং নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

নির্বাচনের মাধ্যমে গোলাম হোসেন হেদায়াতুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেও এক বছরের মধ্যেই তাঁর সরকারের পতন ঘটে। ফলে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে মার্চ আল্লা বখশ সুমরো সিন্ধের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেমন সাধারণ জীবনযাত্রা ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার মানুষ হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন তাঁর শাসনকার্যেও তেমনই ছাপ দেখা যায়। নিজের সরকারি গাড়িতে তিনি কোনোরকম পতাকা বা ক্ষমতার চিহ্ন ব্যবহার করতেন না। হাতে বোনা খাদির কাপড় পরতেই অভ্যস্ত ছিলেন। মন্ত্রীদের বেড়ে চলা বেতন ৫০০ টাকার মধ্যে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন এবং লোকাল বোর্ডে মনোনয়ন পথা তুলে দেন। একদিকে যেমন তিনি সেচ দপ্তরের বিরুদ্ধে জমিদারদের অধিকার রক্ষা করেন আবার ভদেরাদের (বড়ো জমিদার) হাত থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা কেড়ে নেন। একবার বন্যায় শিকারপুর শহর বিপন্ন হয়ে পড়লে তিনি খালের মুখ ঘুরিয়ে নিজের জমি প্লাবিত করে শিকারপুর রক্ষা করেন। সেই সময় মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার চক্রান্তের কারণে সিন্ধে বারবার দাঙ্গা হলেও দাঙ্গা প্রতিরোধে তিনি যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকাই পালন করেন। যদিও মূলত এই কারণেই মাত্র দুই বছরের মাথায় তাঁর সরকারের পতন ঘটে। দুঃখজনক ঘটনা হলো তাঁর কর্তৃত্ব খর্ব করার জন্য তথা তাঁর সরকারের পতন ঘটাতে কংগ্রেসও মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দেয়। বস্তুত বাংলার ক্ষেত্রে কংগ্রেস ফজলুল

হকের সঙ্গে সম্পর্কের বিন্যাসে যে ভুল করেছিল সিন্ধ প্রদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহ বখশের সঙ্গে যেন তারই পুনরাবৃত্তি করে। এবং তথ্য হলো এই যে, ১৯৩৭ এর নির্বাচনে সিন্ধ প্রদেশের মোট ৬০টি সিটের মধ্যে মুসলমান সংরক্ষিত ৩৬টি সিটের মধ্যে যে মুসলিম লীগ যেখানে একটিও সিট পায়নি (যদিও হিন্দু মহাসভা ও নির্দলীয় হিন্দুরা মিলে ১৪টি সিট পেয়ে ছিল), সেই মুসলিম লীগই ১৯৪৬ এর নির্বাচনে ৫৬টা সিটের মধ্যে ৩৩টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৭টা সিট দখল করে।* ফলে আরও অন্যান্য কারণ থাকলেও মুসলিম লীগের উদ্ভব ও প্রসারের পেছনে কংগ্রেসের অবদানকেও অস্বীকার করা যায় না।

নিজের পার্টি, প্রধানমন্ত্রীত্ব সামলানোর পাশাপাশি আল্লা বখশের ঐতিহাসিক অবদান হল মুসলিম লীগ প্রচারিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে দেশের মুসলমানদের সংগঠিত করা। স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একই ছাতার তলায় আনার প্রয়াসেই মূলত তার উদ্যোগেই ' আজাদ মুসলিম কনফারেন্স' গঠিত হয়। 'আজাদ' বা স্বাধীন বলতে এখানে বোঝাচ্ছে মূলত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিরপেক্ষ অবস্থান। মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে (২৩শে মার্চ, ১৯৪০) পাকিস্তানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহনের ঠিক পরেই আল্লা বখশ সুমরোর সভাপতিত্বে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লিতে মুসলিম কনফারেন্সের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ ব্যতীত প্রায় সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক মুসলিম সংগঠন এতে যোগদান করে, যথা-- জামেয়াতুল উলেমা-ই-হিন্দ, মোমিন কনফারেন্স, মজলিশ-ই-অহরর, খুদাই খিদমদগার, শিয়া রাজনৈতিক সম্মেলন, কৃষক

প্রজা পার্টি, আঞ্জুমান-ই-ওয়াতন, মুসলিম মজলিশ ইত্যাদি। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৪০০ ডেলিগেট এই কনফারেন্সে যোগ দান করে। বৃটেনের পাকিস্তানপন্থী সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, এটা ছিল ভারতীয় মুসলমানদের সর্বপেক্ষা প্রতিনিধিত্বমূলক সমাবেশ।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০, হিন্দুস্তান টাইমস্ এই সমাবেশের ব্যাপারে লেখে যে,-- "২৬ এপ্রিল বিকালে দিল্লিতে এই প্রথম বিশাল এক শোভাযাত্রা কনফারেন্সের নির্বাচিত সভাপতি খান বাহাদুর আল্লা বখশকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দিল্লির জনসাধারণের পক্ষ থেকে রাজপথ পরিক্রমা করে।... নির্বাচিত সভাপতি তার ভাষণে নিশ্চিত করে বলেন, কনফারেন্স ভারতীয় মুসলমানদের সঠিক নেতৃত্ব দেবে। আরও বলেন যে তিনি দেখে আনন্দিত যে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের হিন্দু ভাইদের মতোই দেশের স্বাধীনতা অর্জনে অধীর। ... শোভাযাত্রার এক জায়গায় বা অন্য জায়গায় কম করেও ৫০ হাজার মুসলিম জনতা অংশগ্রহণ করে এবং মহিলা সহ আরও বহু মুসলিম রাস্তার দুপাশে বাড়িগুলির বারান্দা থেকে তা প্রত্যক্ষ করে। প্রচন্ড রৌদ্রতাপ সত্ত্বেও এক বিশাল মানব সমুদ্র খান বাহাদুর আল্লা বখশকে অভ্যর্থনা জানায় ।"২ উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়েছিল বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী উর্দু কবি সাঘর নিজামির কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। মাতৃভূমির প্রতি দেশপ্রেমের আহ্বান জানিয়ে তিনি দেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেন--

আয়ে মশরিকে অউর আপনে হক-ই-ফিতরত কি হিফাজত কর

তো আজাদি তেরা মকসুম হ্যায় উসকী হিমায়েত কর।।

ফাজা পর গোর কর হর চিজ কো হাসিল হ্যায় আজাদি

বুলন্দ আপনি নজর আপনি তবিয়ত আপনি ফিতরত কর।।

* * * *

যো মুস্তাকবিল ম্যায় ফিকর-ই-এহিতমাম সুরখরোই হ্যায়

তো আপনে খুন সে রঙ্গিন বেয়াজ-ই-মুলক ও মিল্লাত কে।। ৩

২৯শে এপ্রিল, ১৯৪০ হিন্দুস্তান টাইমস্ আরেকটি রিপোর্টে এই সভার সাফল্য উল্লেখ করে লেখে-- "আজাদ মুসলিম কনফারেন্সের প্রকাশ্য অধিবেশন দ্বিতীয় দিনেই অনুষ্ঠিত পূর্বেকার জনসভাগুলির রেকর্ড ভেঙে ফেলে। প্রশস্ত প্যান্ডেলে মানুষের ভিড় দেখতে পাওয়া যায়। উপস্থিতির সংখ্যা ৭৫০০০-এর কম ছিল না... দেশের প্রতিটি প্রদেশের ডেলিগেট ও প্রতিনিধি নিয়ে এই কনফারেন্স প্রকৃতই ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল এবং তারা সকলেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করে।"৪

কনফারেন্সে সভাপতি রূপে আল্লা বখশের বক্তৃতাও ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থক ও প্রচারকদের উদ্দেশ্যে তিনি জোরালো কণ্ঠে বলেন-- "৯ কোটি ভারতীয় মুসলমান পূর্বেকার ভারতীয়দেরই সন্তান-

সন্ততি, পূর্ববর্তী দ্রাবিড় ও আর্য উপনিবেশ স্থাপনকারীদের মতো একই সাধারণ মাটিতে, একই অধিকার সম্পন্ন এই মাটিরই সন্তান, এ ছাড়া আর অন্য কিছু বলা যায় না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি এক বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করার জন্য নিজস্ব জাতীয়তা বিসর্জন দেয় না।"৫ দেশের মুসলমান জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন-- "আমাদের ধর্ম যাই হোক না কেন, আমাদের অবশ্যই একসাথে যথাযথ সৌহার্দের সাথে আমাদের দেশে বসবাস করতে হবে। এবং আমাদের সম্পর্ক যৌথ পরিবারে অনেক ভাইয়ের মধ্যে যেমন থাকে ও কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতা মুক্ত তাদের যে কোনো ধর্ম বিশ্বাস এবং যৌথ সম্পত্তির সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে ভোগ করার অধিকার থাকা উচিত।"৬ তিনি আরও বলেন-- "No power on earth can rob anyone of his faith and convictions and no power on earth shall be permitted to rob Indian Muslims of their just rights as Indian nationals."৭

সমন্বয়বাদী এই নেতা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সব সময়ই খুব কঠোর ছিলেন। সভা চলাকালীন এক সংবাদদাতার সঙ্গে বার্তালাপে তিনি বলেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকদের বরং খাঁচায় পুরে রাখা ভালো যাতে তারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘৃণার মন্ত্রণা ছড়িয়ে দিতে না পারে।'৮ সভার শেষ ভাগে তিনি ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান প্রস্তাব অবাস্তব এবং সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, এই কনফারেন্সের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে জোরদার প্রচার চালানো হবে। এবং এই উদ্দেশ্যে সৌকতুল্লা আনসারিকে সম্পাদক করে দিল্লিতে একটি কেন্দ্রীয় অফিস খোলারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

যদিও বহু আশা ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে আজাদ কনফারেন্সের এই সভা শেষ হলেও পরবর্তী বছরগুলোতে এই সংগঠনের গতিবেগ সঞ্চারিত হয়নি। কারণ মুসলিম লীগ এই কনফারেন্সকে থ্রেট মনে করে প্রথম দিন থেকেই এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার, আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র নামিয়ে আনতে থাকে; কংগ্রেসের দিক থেকেও কোনো প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যায়নি; সঙ্গে ছিল হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার; আবার অন্য দিকে মির বন্দে আলী খান সরকারের পতন ঘটলে আল্লা বখশ আবার (দ্বিতীয় বার) সিন্ধের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন, ফলে সিন্ধের আভ্যন্তরিন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সময় দিতে তিনি অসমর্থ হয়ে পড়েন।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য সিন্ধের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঠিকই কিন্তু এবারও তাঁর কার্যকাল স্থায়িত্ব লাভ করলো না। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের ডাকা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে তিনি 'খান বাহাদুর' ও 'অর্ডার অফ ব্রিটিশ এম্পেয়ার' খেতাব দু'টি বর্জন করেন। এবং ভাইসরয় লিনলিথগোকে চিঠিতে লেখেন-- "... অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের থেকে বোঝা গেল যে ব্রিটেন কোনো মতেই তার সাম্রাজ্যবাদী থাবা ভারত থেকে তুলে নেবে না, সে কারণেই এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়েছে যে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদের স্মারক চিহ্ন এই খেতাবগুলি আমার পক্ষে আর বয়ে বেড়ানো সম্ভব না।"৯ ঘটনায় অপমানিত হয়ে ব্রিটিশ শাসক চাপ দিয়ে তাকে পদত্যাগ করানোর চেষ্টা করে কিন্তু তিনি রাজি না হলে অবশেষে ১০ই অক্টোবর, ১৯৪২ ইংরেজ সরকার তাঁকে বরখাস্ত করে।

বরখাস্ত হওয়ার (যখন তিনি নিরুপদ্রব জীবন যাপন করছিলেন, বা আসলে হয়তো আরও বড় কোনও মুসলিম লীগ বিরোধী আন্দোলনের কথা ভাবছিলেন) মাস ছয়েক পর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে মুসলিম লীগের ভাড়াটে খুনিরা আল্লা বখশ সুমরোকে গুলি করে হত্যা করে। যদিও তাঁর উপর এই আক্রমণ প্রথম নয়, এর আগে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের হরদোইতে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল, তবে তখন তিনি বেঁচে গেলেও এবারে আততায়ীরা সফল হয়। উল্লেখ্য যে, সিন্ধ প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতা খান বাহাদুর খুহরো ও তার ভাই ঘটনার পরিকল্পনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন, কিন্তু পরবর্তীকালে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান। এফআইআর অনুযায়ী জানা যায় যে, সিন্ধ প্রদেশের শিকারপুর শহরের কাছে এক পীরবাবার দর্শন করে ফেরার পথে তিন জনের এক ঘাতক বাহিনী আল্লা বখশ সুমরো ও তাঁর দুই সহযাত্রী বন্ধুর ওপর গুলি চালায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরের দিন অর্থাৎ ১৫ই মে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সমসাময়িক সংবাদমাধ্যমের মতে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ শোকযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

আল্লা বখশ সুমরোর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলি তাদের দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ বন্ধ রাখে। তবে তাঁর হত্যাকাণ্ড শুধুমাত্র সিন্ধ প্রদেশেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই আলোড়ন সৃষ্টি করে, তার প্রকাশও দেখা যায়। দি হিন্দুস্থান টাইমস্ (১৫ই মে, ১৯৪৩) সম্পাদকীয়তে তার মৃত্যুকে '' জাতীয় বিপর্যয়'' বলে উল্লেখ করে। দি বম্বে ক্রনিকলের সম্পাদক এস. এ. বরেলভি তাঁর মৃত্যুকে ''জাতীয় ক্ষতি'' বলে মন্তব্য করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়-- "যদি কোনো আন্তঃসাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা সম্ভব হতো, তাহলে তা হতো আল্লা বখশের মতো মানুষদেরই প্রচেষ্টায়, যাদের ঠিক কাজটি করার মতো সাহস ও বিরোধীদের মোকাবিলা করার মতো মেরুদন্ড ছিল। এমন একটি সম্ভাবনাময় মানুষের জীবনকে ছেঁটে ফেলা হলো। এবং যার বলিষ্ঠ দেশপ্রেম ও কর্তব্যের প্রতি আত্মনিবেদন, এমন একজন ৪২ বছরের তরুণের মৃত্যুতে ভারত আরও দরিদ্র হয়ে পড়ল।... দুর্ভাগ্যজনকরূপে ঘটনাটি মুসলিম লিগের দিল্লি অধিবেশনের পরেই ঘটে। আল্লা বখশ প্রয়াত, কিন্তু তার অকৃত্রিম বিশ্বাস আজও বেঁচে আছে, এবং একমাত্র এই গুণবানকে সম্মান জানিয়েই ভারতের ঐক্য স্বাধীনতাকে গড়ে তোলা যেতে পারে।"১০ আর এক বিখ্যাত সংবাদ সংস্থা দি হিন্দুস্থান টাইমস্ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্পাদকীয়তে লেখে,-- "সিন্ধিদের মধ্যে সর্বোত্তম, সাচ্চা মুসলমানদের একজন, যিনি তার চাষীদের ভালোবাসতেন, কেননা তিনি যে তার দেশকে ভালোবাসতেন। এমনকি বিশের দশকেও তিনি খদ্দর ব্যবহার করতেন, কারণ তিনি গরিবদের ভালোবাসতেন। হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই তাকে নেতা বলে মানত।... সমগ্র ভারত নিয়েই তিনি চিন্তা করতেন এবং বিভাজন ও

বিবাদের মাঝখানে তার বিশ্বাস স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতেই নিহত ছিল।... তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি গভর্নরের অবাধ ক্ষমতা ব্যবহারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং মতামত প্রকাশের জন্য বরখাস্ত হন। বিগত দুই মাস তিনি নিরুপদ্রব জীবনযাপন করছিলেন।... কিন্তু কেউ ভাবতেও পারেন নি যে তার শেষ দিনটি এত তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসবে।"১১ বস্তুত তৎকালীন প্রায় সমস্ত প্রথমসারির পত্রিকাতেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

দেশের সমস্ত প্রথমসারির নেতারা তাঁকে স্মরণ করেন, শ্রদ্ধা জানান। সি রাজাগোপালাচারীর মন্তব্যটি এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর বার্তায় তিনি বলেছিলেন-- "সমগ্র দেশের অসংখ্য সুহৃদ শোকাহত পরিবারটির সঙ্গে শোক অনুভব করবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কখনো কখনো দেশ সেবার মূল্য এভাবেই চুকিয়ে দেওয়া হয়। ভারত তার অত্যুৎসাহী ও প্রাণবন্ত সন্তানদের একজনকে হারাল, এমন একজন, যিনি ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বিরাট ভূমিকা নিতে পারতেন।" প্রকৃত বাস্তবেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তার বেঁচে থাকা খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো সিন্ধ প্রদেশের ভবিষ্যৎ আজ অন্যরকম ভাবে লেখা হতো। রাজনৈতিক বিশ্লেষক উর্বশী বুটালিয়া তাঁর গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন-- "Had Allah Baksh Soomro not been assassinated, the Sindh Assembly would not have supported the Pakistan resolution."১২ প্রকৃতপক্ষে ধর্মভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে আল্লা বখশের সমন্বয়ী জাতীয়তাবাদ মুসলিম লীগের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তাই

তাঁকে নিধন করে সরিয়ে দেওয়াই স্বাতন্ত্র্যবাদীরা সমীচীন বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, জাতীয়তাবাদী নেতাদের ব্যর্থতার কারণে সিন্ধ প্রদেশ পরবর্তীকালে পাকিস্তানের যুক্ত হয়, অথচ শাস্তি স্বরূপ অবিভক্ত ভারতবর্ষের পক্ষে আজীবন লড়ে যাওয়া এবং দেশভাগের আগেই শহিদ হয়ে যাওয়া একজন মানুষকে ইতিহাস থেকে আমরা সরিয়ে দিলাম কেন?

তথ্যসূত্রঃ

Pakistan people's party Ascendency to Power in Sindh - Syed Akmal Hussain Shah-- এই গ্রন্থ থেকে তথ্যগুলি গৃহীত।

১) ২রা মে, ১৯৪০, দি স্টেটসম্যান। শামসুল ইসলাম প্রণীত ভারতভাগ বিরোধী মুসলিম জনমত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

২) ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪০, দি হিন্দুস্থান টাইমস্। ঐ।

৩) পয়গম-ই-আমল - সাঘর নিজামি।

৪) ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪০, দি হিন্দুস্থান টাইমস্। ঐ।

৫) ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪০, দি সানডে স্টেটসম্যান। ঐ।

৬) ঐ। ঐ।

৭) Partition of India and Partiotism of Indian Muslims - Ali

Afsar.

৮) ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০, দি হিন্দুস্থান টাইমস্। শামসুল ইসলাম, পূর্বোক্ত।

৯) Famous Letters and Ultimatums to British Government. ঐ।

১০) ১৭ই মে, ১৯৪৩, অমৃতবাজার পত্রিকা। ঐ।

১১) ১৬ই মে, ১৯৪৩, দি হিন্দুস্থান টাইমস্। ঐ।

১২) Partition : The long Shadow (Penguin Uk, 2015) - Urvashi Butalia

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় প্রেম ও সংঘাত

তৈমুর খান

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র(১৯০৪-৮৮) ছিলেন এক অস্থির রোমান্টিক স্বপ্ন-মনের অধিকারী। তাঁর যৌবনদৃপ্ত ভাবোচ্ছ্বাস মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষারই পরিচয় বহন করে। বিহারীলাল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালিকে যে প্রিয়ার স্বপ্ন এনে দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই প্রিয়াকে অস্বীকার করেননি; শুধু কর্মের জগতের বিপুল হাতছানি কবির ভাবজগতে প্রবল সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল। স্বপ্ন-বাস্তবের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে কখনো বিশ্বকর্মার জগৎ, কখনো স্বপ্নবাসর দুই-ই কবিকে আকুল আহ্বান জানাল। ব্যক্তিজীবনের রোমান্টিকতা ভর করে থাকে প্রিয়ার ওপর। বৃহৎ মানবজীবনের কেন্দ্রে পৌঁছাতে হলে পিছুটান থাকলে চলে না। এই পিছুটানই তো প্রিয়া। তাকে ঘিরেই মিলনের আকাঙ্ক্ষা, মিলনের উন্মাদনা, সম্ভোগ বাসনা। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়াভাবনা, জীবনানন্দ দাশের প্রেমচেতনা তাঁর মধ্যে বিরাজমান। জগতে বাস করে প্রিয়াকে ভুলে থাকা কষ্টকর, কিন্তু কর্মের জগতের আহ্বানও অস্বীকার করা যায় না; ফলে সর্বদা একটা দ্বন্দ্ব এসে উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্বই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার মূল উপজীব্য।

কবি যখনই প্রিয়ার ডাক অনুভব করেছেন তখনই এক মায়াময় জগতের ঠিকানা কবির সামনে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কখনোই কবি

নিবিড়ভাবে আসক্ত হয়ে বাস্তবকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই সে ডাক ফিরিয়ে দিয়েছেন, কখনো সময় না থাকার দোহাই দিয়েছেন। তবু প্রেম কবিকে ছেড়ে যায়নি। প্রকৃতি প্রতিবেশ নানাভাবে প্রেমের সেই জাদুস্পর্শ উপলব্ধি করেছে। জগৎব্যাপি কর্মময়তায় গৃহবেষ্টনীর প্রিয়ার বাঁধন অমোঘ হয়ে উঠেছে :

'উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে,

ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে;

গৃহ বেষ্টনে বসি,

কখন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা-শশী !'

(সুদূরের আহ্বান: প্রথমা)

কিন্তু তবুও বাঁধা পড়ার অবসর নেই। সুশীতল নদীর তীরের কুটির, পারাবতের কূজন, তরুর ছায়া, আশা-ভালোবাসা-মমতার কোনো অভাব নেই; শুধু 'মনের গ্রন্থি জটিল বড়' খুলতে তর সহে না। 'সোহাগের ভাষা' শিখবার সময়ও কবির নেই। প্রকৃতির অনুপম লীলায় প্রেমের উপলব্ধিটি বড় মরমিয়া সুর তোলে।

আর একটি কবিতায় প্রিয়ার বিরহিণী রূপটি কবিকে ব্যথিত করে তোলে। এক 'রোমান্টিক পেইন' কবি অনুভব করেন। এই স্বপ্ন-বাসরের দৃশ্য ভোলার নয়। কবি লিখেছেন :

'জাফরি কাটান জানালায় বুঝি

পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,

প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ

ঘনায় নিশীথ মায়া।

দীপহীন ঘরে আধো-নিমীলিত

সে দুটি আঁখির কোলে,

বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের

মধুর মিনতি দোলে,

সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই;'

(কবি : প্রথমা)

বিশ্বকর্মা হাজার কর্মে মত্ত সেথায় কবি যেতে চান। কামারের, কাঁসারির, ছুতোরের, মুটে-মজুরের সঙ্গে কবি হাত মেলাতে চান। সারা দুনিয়ার বোঝা বইবার, খোয়া ভাঙবার, খাল কেটে পথ তৈরি করবার এবং অরণ্য উচ্ছেদ করবার শপথ নিয়েছেন কবি। তাই স্বপ্ন-বাসরে বিরহিণী বাতি মিছে সারারাত পথ চায়। জ্যোৎস্না রাত,জাফরি কাটানো জানালার মধ্য দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে বিরহিণী প্রিয়ার কোলে সারঙ্গ— অথচ সুর নেই। প্রিয় বিরহে অশ্রু ভারাক্রান্ত মুখখানির প্রকাশে যে মৌনমিনতি স্পষ্ট, তা কবির কাছে উপেক্ষিত হচ্ছে—এখানেই আত্মবিরোধের চরম পর্যায়। 'স্বপ্ন-বাসর' বলতে abstract কল্পনা না 'বিবাহ-বাসর' ? যদিও রাতের উপস্থাপনায় স্বপ্নের মাধ্যম তৈরি করা হয়েছে, তবুও

'বিরহিণী' শব্দের ব্যঞ্জনার্থ abstract কল্পনাকেই ইঙ্গিত করে। 'হায়' শব্দের মধ্য দিয়ে মনে হচ্ছে কবির পিছুটানও মারাত্মক। কারণ একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস যেন বের হয়ে আসে। তবে এই প্রিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বা জীবনানন্দের বনলতারও কোথায় যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় প্রেমের পাশাপাশি দ্বন্দ্ব-সংঘাতটিও বারবার ফিরে আসে। কোনো কিছুতেই কবির স্থিরতা নেই। 'স্বপ্নদোল' কবিতায় কবি উপলব্ধি করেছেন 'জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল' — এই স্বপ্ন একান্ত জীবনসংলগ্ন। জীবন যতই শুষ্ক-পাণ্ডুর হোক প্রেম সেখানে অনিবার্য। এই কবিতাতেই বারবার প্রিয়ার আকর্ষণ জৈবিক তাড়নাকে দুর্মর করে তুলেছে :

'অবিশ্বাসী প্রিয়ারেও অসঙ্কোচে দিব আলিঙ্গন,

যে অধর করিল বঞ্চনা

তাহারেও করি চুম্বন।'

প্রেম ক্ষণিকের হলেও সমস্ত জীবন রস নিংড়ে দিতে চান কবি তারই মৃতমুলে। কেননা ব্যথায়ও অশ্রুর মূল্যেও জীবনের এমন কিছু পরম সত্য লাভ হবে না। তাই বিষপাত্র পান করেই 'শুধু তার সযতন অনুরাগ স্মরি' কবির শেষ সিদ্ধান্ত। প্রেমের স্বপ্নিল মুহূর্তটি পেয়েও ইহবাদী চেতনায় ফিরে এসেছেন। রোমান্টিকতার সঙ্গে বাস্তববোধের এমন সহজ সুন্দর মেলবন্ধন প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া খুব কম কবির কাব্যেই দেখা যায়।

প্রেমের সঙ্গে মৃত্যু ভাবনাটিও খুব নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়েছে। নারীর দেহ, যৌবন, রূপ-সৌন্দর্য কবিকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। 'প্রেমের

তপস্যা'য় কবি লিখেছেন :

'মনে ভাবি ভালবাসব

শপথ করি এজীবন হবে প্রেমের তপস্যা।

প্রভাতের আলোকে চোখ থেকে বুকে নিমন্ত্রণ করি।

মানুষের কোলাহল চলাচল ভালো লাগে।'

(সংশয় : প্রথমা)

প্রেম প্রকৃতির বিচিত্র রূপে তখন সঞ্চারিত হয়। কিন্তু সবশেষে সবকিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটে। অন্ধকারে বিলীন হয় জীবন। মৃত্যুর করালগ্রাসে এই নির্মম পরিণতি। প্রেমের মধ্যেও চিরন্তন বেদনাকে দেখা, আনন্দময়তার মধ্যে বিষাদের সুর ধ্বনিত করা এই বৈপরীত্যই কবিকে চির সংশয়বাদী করে তুলেছে। 'জীবনকে ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ' এই দার্শনিক অভিজ্ঞতাটিও কবি লাভ করেছেন এ থেকেই। 'সম্রাট' কাব্যে প্রেমের শাশ্বত রূপটি অনেকটাই পরিণত, শান্ত ও ধীরস্থির হয়ে উঠেছে। স্মৃতির কম্পনে কবি নিমজ্জিত হলেও অনুভব করেছেন প্রেম শুধু দেহের আধারেই বন্দি থাকে না, প্রিয়তমা শরীরিণী না হলেও ক্ষতি নেই। কবি রোমান্টিক ব্যাকুলতাকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেননি। 'ঝড়ে' এবং ' অরণ্যে'র প্রতীকের এই ব্যাকুলতায়ও প্রিয়াকে চিহ্নিত করেছেন। একদিকে প্রেম যখন নারীর সাহচর্যে পূর্ণ, অপরদিকে তেমনি তার ঔদার্যে আকাশ কম্পমান। 'ঝড়' এবং 'অরণ্যে'র মত প্রকৃতির দুই শক্তিতে রূপান্তরিত দুটি প্রতীকের মধ্যে ফুটে উঠেছে। 'সৌরভ' নামে আর একটি কবিতায় :

'তোমার সৌরভ আমায় নিয়ে যাক সেই শূন্যতায়

যেখানে পথ আর কোনো দিকে নেই,

যেখানে পরম নিস্ফলতার

তীব্র মধুর হতাশা !'

প্রেম যে শুধু পূর্ণতার নয়, শূন্যতারও ; আনন্দের নয়, বেদনারও; স্বপ্নের নয়, হতাশারও—এই যুগপৎ সংঘাতটি অনিবার্য পরিণতি পেয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায়।

কোভিড ১৯ ও আমরা

আমানুল হক

২৪ শে মার্চ, ২০২০ মঙ্গলবার । রাত আটটায় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দ্যেশ্যে ভাষণ দিলেন; পরের দিন রাত বারোটার পর থেকে সারা দেশ জুড়ে ২১ দিনের জন্য "লক ডাউন" অর্থাৎ গৃহবন্দী ঘোষণা হলো। বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মানুষের জীবনে যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে, সেটি হলো করোনা ভাইরাস; COVID 19। চীনের উহান শহরে Wei Guixian নামের ৫৭ বছর বয়সী এক ভদ্রমহিলার দেহে প্রথম পাওয়া যায় এই জীবাণু। অদৃশ্য মাইক্রোস্কোপিক এই শক্তি, যার আস্ফালনে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, এককথায় সমগ্র মানবজাতি বিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত। এদের তীক্ষ্ম গায়ের কাঁটা জঙ্গলের হিংস্র জন্তুকেও হার মানায়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকেই ফুসফুসে বাসা বাঁধে। সুস্থ শরীর নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করে। কিছুদিনের মধ্যে 'জ্বর সর্দি কাশি এবং শ্বাসকষ্ট' নিয়ে প্রকাশ পায়। খুব দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে অন্যের শরীরে। মহামারী বা আতিমারির আকার ধারণ করে। কন্টাক্ট অথবা সংস্পর্শ এই রোগের বাহক হিসেবে কাজ করছে, সেই কন্টাক্ট চেন ভেঙে

মানুষের সাথে মানুষের দূরত্ব বজায় রাখতে পারলে তবেই এই মারণ রোগের সংক্রমণ রোখা যাবে। এখান থেকেই 'লক ডাউন অর্থাৎ সোশাল ডিস্টান্সিং' এর ধারণা। ঘরের দরজা বন্ধ করে ভাইরাস কে আটকানো নয়,

মানুষের নিজেকে ঘরের মধ্যে অন্তরীণ রাখা, যেখানে বাইরের কেউ আসবেনা ভেতরে, আর ভেতরের কেউ যাবে না বাইরে। অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহারিক জিনিসপত্র ছাড়া সমস্ত রকম দোকানপাট বন্ধ।

স্কুল কলেজ থেকে বাজার ঘাট সবকিছু। এককথায় স্তব্ধ জনজীবন। শুধুমাত্র চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা হাসপাতলে এবং পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সম্মুখ সারিতে কাজ করবে। "লক ডাউন" এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানুষের থেকে মানুষের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা। যার ফলে একজনের শরীর থেকে অন্যের শরীরে এই বিধ্বংসী সংক্রমণ আটকানো যায়, অন্ততপক্ষে কিছুটা হলেও তার গতি রোধ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ অজানা এই ভাইরাস সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে তার প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের মাধ্যমে সারা মানবজাতিকে রক্ষা করা। তৃতীয়তঃ আমাদের দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কে যথাযথ ভাবে সাজিয়ে নেওয়া। আর এইসব করতে গিয়ে একদিকে যেমন জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ে, বন্ধ হয় স্কুল কলেজ বাজার ঘাট থেকে শুরু করে পরিবহন ব্যবস্থা; অন্যদিকে দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। বহু মানুষ তার রোজগারের পথ হারিয়ে রাজপথে নেমে পড়ে, পরিযায়ী শ্রমিকের দল ভিন রাজ্য থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে মাইলের পর মাইল পথ পায়ে হেঁটে ফিরতে থাকে নিজের গ্রামে। ক্লান্ত শরীর আর অনাহারে অনেকেই রাস্তাতে প্রাণ হারায়। আর সেইসব নিথর মৃতদেহগুলি সভ্য সমাজের সামনে প্রশ্ন রেখে যায়, কেন এত আচমকা লকডাউন শুরু হল? শরীর চর্চা করতে গেলেও তো প্রাথমিক কিছু সময়ের জন্য ওয়ার্ম আপ প্রয়োজন। লকডাউন ঘোষণার আগে আর কয়েকটা সপ্তাহ যদি প্রস্তুতি পর্বের জন্য দেওয়া হতো তাহলে হয়তো এই মৃতদেহগুলি প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারত। ধীরে ধীরে

চরম অর্থ সংকট দেখা দেয় দেশজুড়ে মধ্যবিত্তের ঘরেও। চতুর্থ দফার লক ডাউন পেরিয়ে অগত্যা বাধ্য হয়ে সরকারকে লকডাউন এর কঠোর নিয়ম শিথিল করতে হয়। ধাপে ধাপে শুরু হয় আনলক, সংক্রমণের হার নিশ্চিত বাড়বে জেনেও সরকার বাধ্য হয় বাজার ঘাট থেকে শুরু করে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করতে। ১৩০ কোটির এই দেশ ভারত বর্ষ এখন এক চরম সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি। আপামর জনতা একটা ছন্দে চলছিল, আবারো হঠাৎ করেই ছন্দপতন। আনলক হইতো ১-২-৩ করে ধাপে ধাপে উঠে যাবে কিন্তু "মন্দির - মসজিদ - গির্জা" কিংবা শপিং মল আর মদের দোকান গুলোর আগে লোকাল ট্রেন অথবা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিশ্চিৎ করা বেশি জরুরি ছিল, নতুবা কর্মক্ষেত্রে ১০০% হাজিরা বাস্তবে সম্ভব নয়। অন্যদিকে হাজিরা খাতায় গরমিল রয়ে গেলে চাকরী চলে যাওয়ার পদে পদে আশঙ্কা থেকে যাবে। মালিক সম্প্রদায়ের কাছে কর্মচারী ছাঁটাই করা সহজ হয়ে যাবে। একদিকে যেমন রুজি রোজগারের টানাটানি অন্যদিকে বিধ্বংসী ওই ভাইরাসের সঙ্গে সহাবস্থান। যে কোন মুহূর্তে যে কোন কারো সংক্রমণ হতে পারে। ভাইরাস কে নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। তবে এই লকডাউন এর মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখে গেলাম, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং রোগ প্রতিরোধ করা ও নিজেকে সুস্থ রাখা থেকে মহামারীর ন্যূনতম সম্যক জ্ঞান অর্জন। সর্বোপরি ডাক্তার - রুগীর চিড় ধরা সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বইকি। পরিবেশে বসবাস করতে গেলে পরিবেশকে সুস্থ্য রাখাটাও জরুরি। লকডাউন উঠে গেলেও কোভিড ১৯ কিন্তু রয়ে যাবে আমাদের মধ্যে। আর এই ভাইরাসকে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আর এর জন্যই দরকার আরো বেশি বেশি জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি। হই হুল্লোড়

করে বেরিয়ে যাওয়া বা বাজার ঘাট এলাকায় অতিরিক্ত জনসমাগমের সময় এটা নয়। দায়িত্বে নিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বাধ্যতামূলক সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স না থাকলেও ফিজিক্যাল ডিস্টান্সিং কিন্তু মেনে চলতেই হবে। মুখে মাস্ক পরা যেমন অন্যের রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে তেমনি নিজের অজান্তে এই ভাইরাস সংক্রমণ জনসমাজে ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেবে। নিজে এবং পাশের জনকে ও মাস্ক পরা নিশ্চিত করতে হবে। এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার এই ভাইরাসকে দমন করতে সক্ষম এটা পরীক্ষিত সত্য সুতরাং এর যথাযথ ব্যবহার আমাদের সকলকে শিখতে হবে। সাবান দিয়ে হাত মুখ ধোয়া এবং নিজেকে পরিষ্কার রাখা অবশ্যই অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। যত্রতত্র পানের পিক কংবা গুঠকা চিবিয়ে থুতু ফেলা বন্ধ করার সময় এসে গেছে। মনে রাখতে হবে এই ভাইরাস কিন্তু নিজের থেকে চলতে পারে না, এক দেহ থেকে অন্যের দেহে শুধুমাত্র কোন না কোন বাহন কে সম্বল করে যেতে পারে। সেটা আমাদের হাত-পা কিংবা শরীরের কোন অংশ অথবা নির্জীব কোন বস্তু ও হতে পারে। আমাদের শরীরের নাক মুখ কিংবা চোখ হল এই ভাইরাসের প্রবেশদ্বার সুতরাং কারনে অকারনে নাক মুখ ও চোখে হাত দেওয়ার আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুনিশ্চিত করতে হবে। সুশৃংখল জীবন-যাপন ই এই রোগ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। নিদান উপসর্গ দেখা দিলে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে যথাযথ জায়গায় গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। বেশিরভাগ সংক্রামিত রোগী ই নিজের থেকে অথবা ন্যূনতম চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে ওঠে। এদের হসপিটালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যে সমস্ত লক্ষণ থাকলে ঘরে বসে চিকিৎসা করা যেতে পারে সেগুলি হল; ১. জ্বর, ঘরে থার্মোমিটার থাকলে অনায়াসে মেপে

নেওয়া যায় অথবা গায়ে হাতে পিঠে হাত রেখে যদি মনে হয় স্বাভাবিকের তুলনায় গরম মনে হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে জ্বর এসেছে। ২. কাশি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুকনো কাশি বা কফ বের হয় না। ৩. ঘ্রাণশক্তি বা মুখের স্বাদ চলে যাওয়া, অনেক কোভিড রোগী খাবারের গন্ধ বুঝতে পারেনা। অথবা ঘ্রান ও স্বাদ আগের থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। ৪. ক্লান্তি, একটু কাজ করতেই শরীর হাঁপিয়ে পড়ে। ৫. আরো কিছু লক্ষণ যেগুলি তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায় সেগুলি হল সর্দি বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ব্যাথা, বুকে ব্যথা, ডায়ারিয়া বা বমি বমি ভাব, শরীরে বা মাংসপেশিতে ব্যথা। ৬. কনজাংটিভাইটিস বা চোখ লাল হয়ে যায় সাধারণত আমরা বলি চোখ ওঠা যেখানে চোখে পিচুটি বের হয় এবং চোখের পাতা লেগে যায়। ছোটবেলায় শুনতাম চোখ উঠেছে, স্কুলে যাওয়া যাবে না। এগুলো সাধারণত নিজে নিজেই সেরে যায়। ৭. Rash ছোট ছোট চামড়ায় ফুসকুড়ির মতো বেরোচ্ছে অথবা চর্ম নীল হয়ে যাচ্ছে। এগুলি হলে কিন্তু একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। এই লক্ষণগুলো দেখা দেওয়া মানেই কিন্তু করোনা নয়, তবে এখন যেহেতু করোনা মহামারী বা অতিমারি চলছে তাই এগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং কিছু সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে যেমন বাড়িতে নিজেকে অন্তরীণ করে রাখা অন্য কারো সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকা, মাস্ক পরা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করা। আর যে সমস্ত লক্ষণ গুলি দেখা দিলে আপনাকে অবশ্যই হাসপাতালে যেতে হবে সেগুলি হল, ১. শ্বাসকষ্ট, হাঁটতে গেলে কষ্ট হচ্ছে, কথা বলতে পারছেন না এবং হাঁপিয়ে পড়ছেন। ২. গা হাত পা এবং ঠোঁট নিলচে হয়ে যাওয়া বা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, এটা মানে শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ

মারাত্মকভাবে কমে গেছে। অনেক রোগীর শ্বাসকষ্ট হয় না কিন্তু রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা অনেক কমে যায়, বাড়িতে পালস অক্সিমিটার নামক যন্ত্র থাকলে এটা সহজেই ধরে ফেলা যায়। ৩. বুকে ব্যথা বা হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এবং রোগী ঝিমিয়ে পড়ছে, এটা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ এবং এটাকে কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়। ৪. পেচ্ছাব কমে আসছে বা বন্ধ হয়ে গেছে এটা কিডনিতে অ্যাটাক করার লক্ষণ। ৫. গায়ে হাতে Rash তার সঙ্গে হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে কথা বলতে গিয়ে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে এগুলি হল ব্রেন স্ট্রোকের লক্ষণ। 6. কাশির সঙ্গে রক্ত বেরোচ্ছে তার সঙ্গে তীব্র শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আর যে সমস্ত লক্ষণ গুলি রোগী নিজে বুঝতে পারবে না কিন্তু তার পাশের কেউ সেটা টের পাবে যেমন রোগী ঝিমিয়ে পড়ছে কথা বলছে না ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না, কনফিউশন বা রোগী কিছু মনে রাখতে পারছে না অথবা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তবে মনে রাখতে হবে এই সমস্ত লক্ষণ দেখা মানে আতঙ্কিত হওয়া বা ঘাবড়ে যাওয়া নয় বরং ধীর মস্তিস্কে চিন্তা ভাবনা করে দ্রুত হসপিটালে পৌঁছে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। খুব কম সংখ্যক রোগী বিশেষ করে বয়স্ক অথবা যাদের সুগার কিংবা হার্টের অসুখ আছে বা যাদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম তাদের মধ্যে এই রোগের মাত্রা অনেক বেশি করে প্রকাশ পায়। এইসব রোগীদের হসপিটালে ভর্তির প্রয়োজন পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের সাহায্য নিতে হতে পারে। এত কিছুর পরেও কারো মৃত্যু হতে পারে। বিশ্বব্যাপী এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে, হয়তো খুব শীঘ্রই এটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে। যতদিন না আসে ততদিন আমাদের নিজেকে সতর্ক এবং সচেতনভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে রুগীর

সাথে নয় রোগের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। তাদের একঘরে করে নয়, অন্তরীণ এর মাধ্যমে নিজে বাঁচবো সমাজ তথা দেশকে বাঁচাবো এই অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। একদিন আমরা এই অদৃশ্য শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে জিতব নিশ্চয়ই।

মুর্শিদাবাদ শহরের রমজান পালনের সেকাল একাল

ফারুক আব্দুল্লাহ

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মত নবাবী বাংলার একদা রাজধানী নগরী মুর্শিদাবাদে আজও প্রতিবছর রমজান পালিত হয়।কিন্ত তাতে নবাবী আমলের সেই জাকজঁমকতার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।মুর্শিদাবাদ নগরীর সেই সোনাঝরা দিনগুলি এখন অতীত হয়ে গেছে।আজ নবাব থাকলেও নেই সেই নবাবিয়ানা। যার প্রভাব পড়েছে বর্তমান শহরের রমজান উদযাপনেও।

অথচ নবাবী আমলে রমজান পালিত হত অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে। কেল্লা নিজামতের বড়,বড় প্রাসাদের ছাদে ওঠা হত রমজানের চাঁদ দেখার জন্য। সন্ধ্যার আকাশে রমজানের পবিত্র চাঁদ দেখা গেলে শুরু হয়ে যেত আনন্দ উদযাপন। সমগ্র নগরবাসীকে সেই খবর জানাতে সর্বমোট পাঁচটি তোপ দাগা হত। তোপের তীব্র আওয়াজ মুর্শিদাবাদ নগরী পার করে ছড়িয়ে পড়ত দুর দূরান্তে। এই তোপ ধ্বনি শুনেই রাজধানী এলাকার আপামর জনসাধারণ রমজান আগমনের খবরে নিশ্চিত হতেন। তোপ দেগে রমজান আগমনের খবর জানান দেওয়ার পর শুরু হত রমজান আগমনের খুশি উদযাপনের পর্ব। রমজান মাসের চাঁদ দেখার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই নবাবের খাস সেপাইদের একটি অংশ সুসজ্জিত হয়ে এসে জমায়েত করত হাজারদুয়ারী চত্ত্বরে।তারপর সেই সেপাইরা সেখান থেকে বিউগল ও ড্রাম বাজিয়ে প্যারেড করতে করতে এগিয়ে চলত দক্ষিন দরজার দিকে।সেদিনের সন্ধ্যায় কেল্লা

নিজামতের আকাশ বাতাস মুখরিত হত বিউগলের রাজকীয় সুরে।

চাঁদ রাত থেকেই শুরু হয়ে যেত রমজান উপলক্ষে সমস্ত ধর্মীও কার্যকলাপ। শেষরাত্রে সেহরি খাওয়ার পালা শুরু হয়ে যেত। এক্ষেত্রেও মুর্শিদাবাদ নগরীর জনসাধারণের ঘুম ভাঙাবার দায়িত্ব নিতেন নবাবী প্রশাসনের লোকেরাই।রোজাদাররা যাতে ঘুম থেকে উঠে সেহরি খেতে পারেন সেই জন্য তাদের ঘুম ভাঙাতেও শেষরাতে দাগা হত তোপ। এক্ষেত্রে অবশ্য দুটি তোপ দাগা হত।প্রথম তোপটি রোজাদারদের ঘুম থেকে জাগাতে এবং দ্বিতীয়টি সেহরি খাওয়ার সময় শেষ হলে তা জানান দিতে। শেষ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে চীরে তোপের সেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ত বহু দূর দেশে। তোপ দাগা কিন্ত এখানেই শেষ হতনা রোজাদাররা সারাদিন উপবাস করে যাতে সময় মত ইফতার করতে পারেন সেই জন্য প্রতি সন্ধ্যায় ইফতারের সময় অনুযায়ী একটি করে তোপ দাগা হত।

পুরো রমজান মাস জুড়েই মুর্শিদাবাদ নগরী খুশীতে মেতে উঠত।কেল্লা নিজামতের প্রসাদগুলি সহ মুর্শিদাবাদ নগরীর অধিকংশ বাড়ি এবং সমস্ত মসজিদ,ইমামবাড়া গুলি সেজে উঠত আলোতে।এই সময় গরীব ও অসহায় জনসাধারণকে বেশি,বেশি করে দান করা হত।প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় নগরীর বড়,বড় মসজিদ ও ইমামবাড়া গুলিতে ইফতারের আয়োজন করা হত।কথিত রয়েছে কাটরা মসজিদের মিনার থেকে দেওয়া মগরিবের আজান বহু দূর পর্যন্ত শোনা যেত।সেই আযানের সুর শুনেও দূর দুরান্তের প্রচুর মানুষ উপবাস ভঙ্গ করতেন।পরবর্তী সময়ে নবাব মীরজাফরের পত্নী মুন্নি বেগম

চাঁদনি চক এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণ করলে সেই চক মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।নবাব সহ নিজামত পরিবারের সদস্যরাও অধিকাংশ সময় এখানেই নামাজ পড়তেন।রমজান মাসেও এই মসজিদ সেজে উঠত।প্রতি সন্ধ্যায় এই মসজিদেও ইফতারের আয়োজন করা হত।মুন্নি বেগম রমজান মাসে অসহায় জনগন ও মুসাফিরদের জন্য চক মসজিদে ইফতারির আয়োজন করতেন।ইফতারে থাকত সব রাজকীয় পদ।প্রথমেই থাকত শরবত।শরবত হত বেশ কয়েক রকমের।যেমন আমের শরবত, বেলের শরবত,লেবুর শরবত,তেতুলের শরবত,বাদাম-পেস্তার শরবত,দুধের শরবত ইত্যাদি। সাথে থাকত বিভিন্ন ফল যেমন খেজুর, খুরমা, আপেল, তরমুজ, আনারস, কমলা লেবু। এছাড়াও থাকত ভেজা ছোলা,সেদ্ধ ছোলা, সেমাই,কিম্বা হালওয়া। সেই সাথে কোন দিন থাকত খিচুড়ি,কোন দিন পোলাও আবার কোন দিন কাবাব পরোটা।ইফতারের পর মসজিদে বসেই চলত 'ইবাদত বন্দেগী'। সাধারণ রোজাদাররা যাতে ইফতারের মত করে শেহরির সময়ও পেটপুরে খেয়ে রোজা রাখতে পারে সেই জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়া হত শেহরির খাবারও। সেই খাবারেও বৈচিত্র্য থাকত।কোনদিন থাকত তন্দুরি রুটি অথবা চাপাতি কিম্বা পরোটা সাথে কোর্মা,কালিয়া, কাবাব।আবার কোন কোন দিন থাকত পোলাও কিম্বা কবুলি। রমজান মাসে শুধুমাত্র মসজিদ গুলিতেই ইফতারি ও সেহরির ব্যাবস্থা হতনা।নিজামত পরিবারের বহু মানুষ সহ শহরের ধনী মানুষরাও সাধারণ মানুষদের জন্য লঙ্গরখানা খুলতেন। সেখানে দুঃস্থ মানুষদের খাবার পরিবেশন করা হত।

রমজান মাসের গুরুত্বপূর্ণ দিন গুলিতে নবাবের তরফ থেকেও ইফতারের আয়োজন করা হত।অধিকাংশ সময় এই ইফতার আয়োজিত হত নিজামত

ইমামবাড়াতে।কথিত রয়েছে নবাবের এই শাহী ইফতারে নশিপুর রাজপরিবার, জগৎশেঠের পরিবার এবং সেই সাথে বহু উচ্চ পদস্থ ইংরেজ আধিকারিকরাও আমন্ত্রিত হতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইফতারের তত্ত্বাবধানে থাকতেন নবাবের হিন্দু ম্যানেজার। তিনিই ঠিক করতেন সেদিনের মেনু থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু। নবাবী ইফতারে থাকত বহু ধরনের শাহী সরবত,ফলমূল থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের পোলাও,কোর্মা,কালিয়া, বিভিন্ন রকমের কাবাব আরও বহু পদ। শেষ পাতে থাকত ফিরনি,সিমাই, শাহী টুকরা সহ আরও নানান রকমের মিষ্টান্ন।আমন্ত্রিত অতিথিরা এই সব শাহী খাবার খেয়ে তৃপ্ত হতেন।

আজ বহু বছর হল নবাবী আমল শেষ হয়েছে।সেই সাথে সেদিনের সেই মুর্শিদাবাদ নগরীর পুরানো আভিজাত্য, রীতি-নীতি সব কিছুই সময়ের সাথে, সাথে হারিয়ে গেছে।তবুও মুর্শিদাবাদের নিজামত পরিবারের সদস্যরা নবাবি আমলের কিছু পুরানো প্রথা ও রীতি-নীতিকে আজও ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর।তাই এখনও রমজান মাসে চক মসজিদে প্রতিদিন ইফতারের আয়োজন করা হয়।এখন ইফতারের সমস্ত খরচ বহন করে মুর্শিদাবাদ এস্টেট।তবে ইফতারের জৌলুশ আজ অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে।যার প্রভাব পড়েছে ইফতারের খাবারেও।বর্তমানে খাবারের মান এবং পরিমাণ দুটোই কমেছে।বর্তমানে ইফতারে থাকে নানান রকমের ফল যেমন,খেজুর, আপেল, কলা,আঙ্গুর,তরমুজ,কমলা লেবু।এছাড়াও থাকে ছোলা ভেজা, মটর ভেজা, ছোলা সেদ্ধ, ঘুগনি, বেগুনি,আলুর চপ,পেয়াজি ও কাচালু নামক এক বিশেষ পদ।চক মসজিদে এখনও সেহরির সময় খাওয়ার জন্য রোজাদারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় রুটি।সেই সাথে দেওয়া হয় ঘি দিয়ে রান্না করা ডাল কিম্বা

আলু কোর্মা।এছাড়াও রমজান মাসের বিশেষ দিনগুলিতে রোজাদারদের জন্য শাহী বিরিয়ানির ব্যবস্থা থাকে।আজ মুর্শিদাবাদে নবাবী আমল না থাকলেও রমজান মাসের প্রতিটি সন্ধ্যায় রোজাদারদের সমাগমে শতাব্দী প্রাচীন মসজিদ চত্বরে নবাবী আমল যেন পুনরায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

১)সৈয়দ ডঃ রেজা আলী খান

২)সৈয়দ মোহাম্মদ আব্বাস আলী মির্জা

৩)সৈয়দ রেজা আলী মির্জা

৪)সৈয়দা নাফিস উন নিসা বেগম

৫)সৈয়দ শাখাওয়াত আলী মির্জা

৬)সৈয়দ আতহার আলী

সাম্প্রতিক ভারতের রাজনীতি ও মুসলমানের সংকট

মনিরুদ্দিন খান

সাম্প্রতিকতম সময়ে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য যে সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে তেমনটি ইতিপূর্বে কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না। একদিকে দেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভাবধারার রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত, তাদের হাতেই দেশের ক্ষমতা, অন্যদিকে প্রকাশ্যে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পক্ষপাতিত্ব - এই অবস্থায় ভারতীয় মুসলমানের এমন এক অবস্থা যা এদেশে তাদের অস্তিত্বকেই এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে এদেশে বসবাস করার পরও এবং এই দেশের মাটিই তাদের বেশিরভাগের শিকড়ের উৎস হলেও কেবলমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য আজ তাদের ভিন্নচোখে দেখা হচ্ছে। দেশের এই বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়টি যাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মাথা তুলতে না পারে নানাভাবে তার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে অনেক ক্ষেত্রেই সেটা হচ্ছে প্রকাশ্যে ও রাষ্ট্রীয় মদতে। সারা দেশে নানা স্থানে নানা অজুহাতে মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত আক্রমন শানানো হচ্ছে। এদেশের মুসলিমদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য প্রকাশ্যে নির্মমভাবে নির্দোষ মুসলিমদের হত্যা করা হচ্ছে এবং সেই নির্মমতার ভিডিও ভাইরাল

করা হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ক্ষমতাসীন অংশ এহেন পাশবিকতার নিন্দা না করে হত্যাকারীদের পক্ষে সওয়াল ও মিছিল করে তাদের পক্ষপাতিত্ব সগর্বে ঘোষণা করছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যাকারীদের পুরস্কৃতও করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মুসলিমদের যে বার্তা দেওয়া হচ্ছে তা বুঝতে একজন শিশু বা কিশোরেরও বোধহয় অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে একরৈখিক একধরণের ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সবরকমের আয়োজন করা হচ্ছে। তেমনই এক গভীর ষড়যন্ত্র হিসাবে মুসলিমদের বিপক্ষে এন.আর.সি ও সি.এ. এ-র মতো আইনের জুলুমবাজি চাপিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। সংবিধান, আইন বা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়, কেবল সংখ্যাগুরুর বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বাবরি-মসজিদের ও রাম-মন্দির বিতর্কের যে সমাধান করেছে তাতে দেশের প্রধান বিচারালয় ও সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থার একপেশে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বলেই এক বড়ো অংশের মানুষের অভিযোগ। মসজিদের স্থলে মন্দির নির্মাণের রায়, দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নাম করে বেছে বেছে মুসলিমদের বাড়িঘর ও ব্যবসাস্থলে অগ্নি সংযোগ - ইত্যাদি অজস্র ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ভারতীয় মুসলিম আজ কতটা কোনঠাসা অবস্থায় পতিত হয়েছে। মোদ্দাকথা, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতে মুসলিমদের আতঙ্কিত করা, বিচলিত করা ও

অশান্তির মধ্যে রাখার এ এক বিশেষ ধরনের প্যাটার্ণ তৈরী হয়েছে। এটা ছিল বর্তমান শাসকদলের এক দীর্ঘকালীন লক্ষ্য এবং রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সেই লক্ষ্যে তারা সম্পূর্ণ সফল।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধত্তোর কালে ইংরেজের কাছে শাহি ক্ষমতা হারিয়ে ধীরে ধীরে মুসলমানরা রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে কোনঠাসা হয়েছিল। তার শতাব্দীকাল পরে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে মুসলিমদের ব্যাপক যোগদানের ফলে ইংরেজের বিরাগভাজন হয়ে সেই কোনঠাসা অবস্থা চরমে উঠেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক জন হান্টার কিছুটা বিস্তারিতভাবেই সেই তথ্য তার "দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তবুও তারপর দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম যৌথভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করেছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪৬ -এর দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে দেশের খণ্ডিত স্বাধীনতা -- এমন অজস্র ঘাত-প্রতিঘাতেও ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় আজকের মতো এইধরনের অস্তিত্ব- সংকটের মুখোমুখি হয়নি। বিভাগোত্তর ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায় অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়েছে ঠিকই কিন্তু কিছু বিচ্ছিন্ন স্থান ছাড়া দেশের বাকি অংশে তারা মাটির নিবিড় ভালোবাসায় দিনাতিপাত করেছে। সংখ্যালঘু হিসাবে নানা সমস্যার মুখোমুখি হলেও ভারতীয় মুসলিম আগে এত বর্বরভাবে জান ও মালের হুমকির মুখোমুখি হয়নি।

স্বাধীন ভারতে আজ পর্যন্ত নানা স্থানে ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সেইসব স্থানের মুসলমানদের এক দুর্বিসহ জীবন যাপন করতে হয়েছে। মুসলমানরা চাপে থেকেছে। ভয়ে থেকেছে। তবু সার্বিকভাবে বলা যায়, সাম্প্রতিক সময়ের মতো ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় এত মারাত্মকভাবে অস্তিত্ব সংকটের সমস্যা আগে কখনো অনুভব করেনি। যুগ যুগ ধরে নিজের জাতিগত ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতি নিয়ে এদেশের মাটিতে তার যে শিকড় গাড়া আছে তা উপড়ে যাওয়ার মতো দুশ্চিন্তা তাকে কখনোই করতে হয় নি। অথচ সেই ভয়ই তাকে এখন করতে হচ্ছে।

স্বাধীনতার এত বছর পর সম্প্রতি ভারতীয় মুসলমান এই অস্তিত্ব সংকট অনুভব করার অন্যতম কারন হল প্রশাসন ও বিচার বিভাগের অশ্লীল পক্ষপাতিত্ব। যারা শাসন ব্যবস্থার উপর মহলে আছেন তাদের এইরূপ আচরণ, যেন দেশের সরকার হল সংখ্যাগুরুর দ্বারা সংখ্যাগুরুর জন্য সংখ্যাগুরুর সরকার। খুব উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ধীরে ধীরে সমাজের গভীরে সেই ধারণাটা বদ্ধমূল করে তোলার জন্য রামমন্দির- বাবরি মসজিদ মামলার অমন এক 'বিশ্বাস' নির্ভর রায় দেওয়া হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত। আফরাজুল থেকে আখলাখ বা তবরেজ আনসারীদের মতো মুসলিমদের দেশের নানা প্রান্তে লিঞ্চিং করে হত্যার বিরুদ্ধে সরকারী কোনো নিন্দাবাক্য না থাকা, হত্যাকারী অপরাধীদের বীরের সংবর্ধনা দেওয়া, তাদের বিরূদ্ধে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় থাকা ইত্যাদি কারনে ভারতীয় মুসলিম স্পষ্ট বুঝে

গিয়েছে যে এদেশে তাদের পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই।

যদিও স্বাধীনতালগ্নে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর থেকে এদেশে থেকে যাওয়া মুসলমানদের সবসময়ই দেশ ভক্তির প্রমান দিয়ে আসতে হয়েছে, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সেটা বহুল পরিমানে বেড়েছে। দেশের সমস্ত নাগরিকের কাছেই দেশপ্রেম একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। মুসলমান নাগরিকের কাছেও তাই। অথচ সাম্প্রতিককালের এই গভীর সংকটের মুখে পড়ে ভারতীয় মুসলমানদের যেন দেশপ্রেমের প্রমান জাহির করার তাগিদ বহুলাংশে বেড়েছে। আসলে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তাদের এই প্রদর্শণে বাধ্য করেছে। এককথায়, দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হয়েও কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের কারনে ভারতের মুসলমান আজ এক অত্যন্ত অস্বস্তি ও অশান্তির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে। অচিরেই সেই পরিস্থিতির বদল না ঘটলে হয়তো দেশকে একদিন এজন্য চরম মূল্য দিতে হবে। জাতপাত, ধর্মের এই রাজনীতির কবলে পড়ে দেশের বিকাশের স্বপ্ন হয়তো অধরাই থেকে যাবে। এখনই এই মারাত্মক সাম্প্রদায়িক খেলা স্তব্ধ না করলে বিশ্বের বৃহত্তম এই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ হয়তো পিছন দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথেই নির্ধারিত হয়ে উঠবে।

বাংলা কবিতা ও বিপ্লব

প্রবীর দে

কবিতা ও বিপ্লবের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা অত্যন্ত নিবিড় এবং সে সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরতার ।বিপ্লব কবিতার অন্যতম উৎস ।অপর দিকে কবিতা বিপ্লবের ধারক ও বাহক।বিপ্লব ছাড়া কি কবিতা হতে পারে না? অবশই হতে পারে। কাব্য সাহিত্যের উৎস বা বিষয়বস্তু তো ভিন্ন ধরনের হতে পারে –অধ্যাত্ম চেতনা, প্রকৃতিপ্রেম,মানবপ্রেম,বিশ্বপ্রেম ,বিরহ, রোমান্স,স্বদেশ প্রেম,আরও কত কি। কিন্তু বাংলা কবিতার তিনটি যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই , উত্তর আধুনিক যুগে এসে বিপ্লবের সাথে কবিতা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

কবিতা হল কবির উপলব্ধিজাত এক বিশেষ শিল্প ভাবনার বহিঃপ্রকাশ যা কবির বাস্তবতা বোধের উন্মোচন। কবিতা মানুষকে ভালবাসতে শেখায়, কবিতা মানুষকে প্রতিবাদী হতে সাহায্য করে,কবিতা চিন্তাকে জাগ্রত করে, প্রেরণা দেয়।

আর সাধারন অর্থে বিপ্লব হল রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত একটি মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন যেখানে জনগণ বিদ্রোহ করে জেগে ওঠে। বিপ্লব সেখানে সংস্কৃতিগত,অর্থনীতিগত,সামাজিক, রাজনৈতিক ,পরিবর্তন সাধন।

কিন্তু বিপ্লব শব্দটির ব্যাপক অর্থ অনুসন্ধানে যদি একটু মন দি তবে

কবিতা ও বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য পারস্পরিক সম্পর্ককে হয়ত বিশ্লেষণ করতে সুবিধা হবে।আর একটা কথা বলে নিই,আমার আলোচ্য বিষয় কিন্তু শুধু বাংলা কবিতাতেই সীমাবদ্ধ।

বিপ্লব হচ্ছে চেতনার নির্মাণ এবং নির্মিত চেতনার সফল বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া, যা স্বল্প সময়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে কিংবা অতি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে। বিপ্লবের সংশ্লিষ্টতা রাজনীতি বা সমাজ সংস্কারের সাথে অধিকতর জুৎসই হলেও মনোবৃত্তিক কর্মকাণ্ড - ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রেও বিপ্লব ততোটাই কার্যকর এবং জীবন্ত। বিপ্লব ঘটেছে বলেই বাংলা সাহিত্য তার আদি যুগ ছেড়ে ক্রমান্বয়ে ক্রমঃউৎকর্ষে উত্তরাধুনিক ও পরাবাস্তবতায় এসে পৌঁছেছে। ১৯০৭ সালে নেপাল রাজদরবারের সংগ্রহশালা হতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কারই বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বড় বিপ্লব।

প্রাচীন যুগ হতে উত্তরাধুনিক যুগ অব্দি কবিতার পঠন-পাঠনে বাংলা কবিতায় বিপ্লবের ধারাকে যদি ভাগ করি তবে যে সমস্ত বিপ্লবের ধারা লক্ষ্য করি সেগুলি হল সামাজিক বিপ্লব, শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব , রাজনৈতিক বিপ্লব ধর্মীয় চেতনার বিপ্লব , দার্শনিক বিপ্লব , কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কৌশল বিপ্লব প্রভৃতি। স্বল্প পরিসরে আমার আলোচ্য শুধুমাত্র সামাজিক বিপ্লব ও রাজনৈতিক বিপ্লব বাংলা কবিতাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার অনুসন্ধান।

১

দেশের ভেতরের বা বাইরের ঘটিত সামাজিক বিপ্লব বা রাজনৈতিক বিপ্লব

যেমন কবিতাকে প্রভাবিত করে আবার কবিতার হাত ধরে বিপ্লব সংঘটিত হয় ।১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের চেতনা বিশ্বে যে নতুন সমাজপ্রবাহের সৃজন ঘটিয়েছিল, সেই চিন্তাস্রোতের মানবিক আকুতি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ ঘটেছিল। আবার নারী যখন কেবল অন্তঃপুরবাসিনী না থেকে এক কথায় বলতে গেলে অদম্য লড়াইয়ে সমাজের হয়ে কলম ধরে ,সেও এক সামাজিক বিপ্লব।   প্রথম মহিলা বাংলা কবি চন্দ্রাবতীর হাত ধরে কবি হিসেবে নারীর আবির্ভাব কিম্বা মাহমুদা খাতুন , পরবর্তীকালে সুফিয়া কামালের হাত ধরে কবিতায় নারীকে প্রাধান্য দেওয়া – সেইটিও ছিল বড় বিপ্লব,সামাজিক বিপ্লব।

বাংলা কবিতায় সে সব কবি সাম্যবাদী চেতনা ধারণ করে উদ্ভূত বাস্তবতাবোধ, মানবপ্রীতি ও নিগৃহীত মেহনতী মানুষের কথা তুলে ধরেছেন এবং কবিতায় সাম্যবাদী চেতনায় ঐক্যের সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছেন তাদের কবিতা নিয়ে   আলোচনা করতে গেলেই যে লাইনগুলি   সবসময় চোখে ভাসে তা হল ..

—‘সকলের তরে সকলে আমরা

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে’।

কবি কামিনী রায়ের ‘সুখ’ কবিতার উপর্যুক্ত এই লাইন দুটি আমাদের অবলীলায় সাম্যবাদের সহজ অভিব্যক্তি প্রকাশ হওয়ার কথা বলে দেয়।

আবার মহাসাম্যের বাণী প্রতিধ্বনিত হয় কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের কবিতায়

সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,

মানুষের মতো, মানুষের পথ এক হক পুনরায়;

সমান হউক আশা অভিলাষ সাধনা সমান হোক,

২

যুগধর্ম ও সমকালের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো লেখকের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ফ্যাসিবাদীদের বিরোধিতা করতে দেখা গেছে।এরপর থেকেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা সাম্যবাদী ধারণা নিয়ে কবিতা লিখতে দেখতে পাই। এটা ঠিক রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদী কবি নন। তবু বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ সাম্য চিন্তার উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন এবং সাম্যের আলোয় নতুন যুগ ও জীবনের আবির্ভাব হবে এই চিন্তা তাঁর শেষ জীবনের সৃষ্টিগুলোর মাঝে বারবার প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। তাঁর বেশ কিছু কবিতায় এর প্রমানও মেলে। যেমন: পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, এবার ফিরাও মোরে, ।

৩

এরপর তেজদীপ্ত উচ্ছ্বাস আর বিপ্লবী মন্ত্র নিয়ে কবিতায় বিদ্রোহের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে এলেন কাজী নজরুল ইসলাম। দুর্দশায় শোষক গোষ্ঠী সর্বদা শোষিতকে শোষণের যাঁতাকলে রেখেছে পিষে; কবিতা সেই শোষণের

বিরুদ্ধে সমাজে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা কবির কণ্ঠেই শুনি-

আমি সেইদিন হব শান্ত

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না

অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।

এটা ঠিক তিরিশের দশকে বাংলা কবিত্য় নভেম্বর বিপ্লবের ছোঁয়া লেগেছিল ব্যাপক ভাবে যা কিনা সামাজিক বিপ্লবকে সুচিত করেছিল এবং সে সামাজিক বিপ্লব চেতনা রাজনৈতিক বিপ্লবকে অক্সিজেন জুগিয়েছিল শুধু কবিতার হাত ধরে।এই বিপ্লবের বাতাবরণেই নজরুল তাঁর সৈনিক বৃত্তি ত্যাগ করে সাহিত্য কর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহন করেন। তাঁর কবিত ,গান এদেশের বিপ্লবকে যথেষ্টই প্রভাবিত করেছিল।নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব পরেছিল তাঁর একাধিক কবিতায় – বিদ্রহী,সাম্যবাদী,ফরিয়াদ ,আমার কৈফিয়ত ,সর্বহারা, প্রভৃতি ।তাঁর প্রলয়োল্লাস কবিতাটি ভারতে কমিউনিসট পার্টির সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল।

সাম্যবাদী জীবনের চেতনায় ঔপনিবেশবিরোধিতা এবং জাতীয়তাবাদ নজরুলের মধ্যে মহত্ত্বর বোধে চালিত হতে পেরেছে। নজরুল তাঁর কাব্যজীবনের প্রারম্ভ থেকেই হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অভিন্ন বলয়ে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলন যখন কতকটা স্তিমিত, তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাতাস তীব্র হয়ে উঠল। নজরুল তখন বাঙালি জাতির সামনে নিয়ে এলেন মানবতাবাদের শাশ্বত বারতা।

‘হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?/

কাণ্ডারী! বল মরিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।'

তার ভাবনায় সমুন্নত ছিল মানবজাতির ঐতিহ্য। এও ত এক বিপ্লব যা এসেছিল কবিতার হাত ধরে।

৪

এরপর তিরিশ ও চল্লিশের দশক সময় ধরে সাম্যবাদী চেতনার উৎসারণ-এর ভূমিকা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে দেখা যায়। সেই সময় বিষ্ণু দে, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রমুখ কবি বাংলা কবিতার ভুবনে মার্কসীয় চেতনার দ্বারা সাম্যবাদের জয়গান গাইলেন। বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা যেমন: অগ্রণী, অরণী, পরিচয়, প্রতিরোধ ও আকাল ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা সাম্যবাদের চেতনায় কবিতা প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আরম্ভ করল ।

নজরুল পরবর্তী ত্রিশের দশকে এসে সাম্যবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত অন্যতম কবি হচ্ছেন বিষ্ণু দে। বিষ্ণু দে তাঁর কবিতার উপজীব্যে তাত্ত্বিকাতায় ও প্রকরণে মার্কসীয় সাম্যবাদী দৃষ্টির আলোকপাত করেছিলেন। সেখানে তিনি মননধর্মী ও বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পনৈপুণ্যের উচ্চমার্গে কবিতাকে উপস্থাপন করেছিলেন। মার্কসবাদী সাম্যের গভীরে আস্থা ও বিপ্লবের মাধ্যমেই এই সমাজের বাস্তবায়নে ঐকান্তিক প্রত্যয়কে দৃঢ়ভাবে তাঁর কবিতার দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন।

ত্রিশের দশকের শেষ সময়ের আরেক কবি সাম্যবাদী চেতনা নিয়ে

কবিতাচর্চায় যিনি সরাসরি ঘোষণা করলেন যে, আমি রোমান্টিক কবি নই - মার্কসিস্ট, তিনি হলেন কবি সমর সেন।সেই সময়ের তাঁর কয়েকটি কবিতাগ্রন্থ যেমন — গ্রহণ, নানা কথা, খোলা চিঠি, তিন পুরুষ ইত্যাদি। এইসব কবিতাগ্রন্থে সমর সেন সাম্যবাদী চেতনার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বলা যেতে পারে।

জীবনানন্দ দাশের সময়কেও আমরা একটু দেখে নিতে পারি। রুশ বিপ্লবোত্তর সময় সেটা।বিশ্ব যুদ্ধ একদিকে পুরনো মূল্যবোধগুলির ধ্বংস দেকে আনছিল, অন্যদিকে রুশ বিপ্লব দরিদ্র উপেক্ষিত মানুষের মুক্তির স্বপ্ন সফল করার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল। ঐ সময় কিছু মানুষের বিশ্বাস এল, মার্কসবাদ জীবনের অন্তঃস্থলে রহস্যাবৃত অন্ধকারকে আলোকিতও করে তুলেছে। আবার একদল ছিল মার্কস বিরোধী ।এইরকম ওলটপালট আবহাওয়ায় আবির্ভূত হলেন জীবনানন্দ দাশ । স্বপ্নভঙ্গ জাতির যখন মনগত পরাজয় থেকে উঠে দাঁড়াবার জন্য যখন অনুপ্রেরণার দরকার ...... কবি তখন শোনালেন ...” হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে...”। হয়ত তাঁর পরিচয় তিনি রূপসী বাংলার কবি। জীবনানন্দ নিয়ে এলেন নতুন চেতনার জগত।

এরপর এলেন পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুভাষ হলেন প্রথম নিঃসংশয় সাম্যবাদী কবি। তিনি ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। রাজনীতিবিদ ও কবির বিরল এক সমন্বয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়।‘পদাতিক’ কাব্যের . পাঠককেও তিনি একজন কমরেড ভাবেন বলেই ‘পদাতিক’

কাব্যের প্রথম উচ্চারণ ‘কমরেড’।

কমরেড, আজ নতুন নবযুগ আনবে না?

কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।

লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা-

দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?

বাংলা কবিতায় বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করব আর রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর যুগের তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর কথা ভুলে যাব সে সাহস কোথায় ...। হ্যাঁ , তিনি হলেন বিপ্লবী কবি , গণজাগরণের কবি , সমাজতন্ত্রের আদর্শের কবি , যিনি চে গুয়েভারার মতো বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন। সাম্যবাদে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখতেন। যিনি নজরুলের মতোই তার কাব্যে উচ্চারণ করে গেছেন অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের শব্দমালা। যিনি বিপ্লব ও গণমানুষের মুক্তির পক্ষের সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন বারবার। লড়াকু সৈনিকের মতো কাজ করেছেন প্রলেতারিয়েত জনগোষ্ঠীর ও কৃষক-শ্রমিকের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে। এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাওয়ার প্রত্যয়ে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা কবি।

৫

সাতচল্লিশোত্তর কালে বাংলা কবিতা বিকশিত হয়েছে অমোঘ গতীতে ভিন্ন

মাত্রায়। বাংলাদেশের কবিতায় মুখ্যত যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের জীবনসংগ্রাম-দেশপ্রেমের ছবি, মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রামের ছবি । পশ্চিমবঙ্গের কবিতায় সেখানে দেখি আবার চেপে বসেছে অনন্বয় আর অসঙ্গতির কর্কট-ছোঁয়া।সাতচল্লিশ পরবর্তী বাংলায় রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে কবিতা প্রগতিশীলতার প্রধান হাতিয়ার রূপে এগিয়ে আসে।পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে , বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত অমিয় চক্রবর্তী , বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এবং বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে আহসান হাবীব-শামসুর রাহমান-শহীদ কাদরী-মোহাম্মদ রফিক-নির্মলেন্দু গুন ,পরের দিকে মহাদেব সাহা ,রুদ্র মহম্মদ শহিদুল্লাহ আরও অনেকে এই ধারায় কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের খাদ্য আন্দোলন; মুল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন; ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলন; এক পয়সার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন; ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে গড়ে ওঠা সংহতিমূলক গণআন্দোলন – একের পর এক গণ আন্দোলন রাজপথে ফেটে পড়ছিল।১৯৬৭ সালে ঘটল নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান।সত্তরের নকশাল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত বিপ্লবকে কবিতার সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল নিপুণ ভাবে।

কবি মনিভূষণ ভট্টাচার্য দেখালেন তার কবিতায় এক স্বপ্ন ভঙ্গের মধ্যে দিয়ে আরেক নতুন স্বপ্ন নির্মানের গল্প। স্বপ্ন যেখানে জীবনকে অতিক্রম করে।

নবারুন ভট্টাচার্যের কবিতায় আবার শোনা গেল...

রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেই তীব্র ঘৃনা আর জেহাদ-

এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না ...

এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না ......

কবিতা এখানে এসে বিপ্লবের সাথে যেন মিশে গেছে ... নবারুন ভট্টাচার্যর কবিতার লাইন উদ্ধৃত করে বলতেই পারি- কবিতা কোন বাধাকে স্বীকার করে না .....।। কবিতা সশস্ত্র ,কবিতা স্বাধীন , কবিতা নির্ভীক।। এ সময়ে একটু অন্য ফরমে সামাজিক প্রতিবাদকে কবিতায় রূপ দিতে আমরা দেখতে পাই শক্তি-সুনীলের কবিতায়।

৬

উত্তরকালে, ষাট-সত্তর-আশির সময়খণ্ডে, উভয় বাংলার কবিতাকেই এলো নতুন এক আন্তর্জাতিক চারিত্র্য। ল্যাটিন আমেরিকা আর আফ্রিকার মুক্তিকামী কবিতাবিশ্ব প্রবলভাবে প্রভাবিত করল বাংলা কবিতাকে। নিম্নবর্গের মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উপনিবেশিকতার শৃঙ্খল থেকে লেগে উঠল ল্যাটিন আমেরিকা-আফ্রিকার শিল্প প্রেরণায়।

আশির দশকে বাংলাদেশে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এত বেশি উচ্চকিত হয়ে ওঠে যে কবিতা হয় স্লোগান নয় শরীরী প্রেমের মধ্যে ডুবে থাকে। কিন্তু স্বৈরাচার পতন এবং একই সময়ে বৈশ্বিক রাজনীতিতে সোভিয়েত পতনের কারণে কবিতা যেন দিকহারা হয়ে পড়ে। এসময়ে নব্বই দশক আবার নানা রঙিন পুষ্পে পল্লবিত হয়ে বাংলা কবিতার চেহারা পালটে দেয়। বাংলা কবিতা মুক্তি লাভ করে কেন্দ্রমুখিনতা থেকে। বহুভাষিকতা আর বহুচেতনার

সমন্বয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় । এসময়ে লিটল ম্যাগাজিনগুলো বৈপ্লবিক ভূমিকা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকেই কবিতা যেমন বিকেন্দ্রিত হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যও লাভ করেছে।

একবিংশ শতকে এসে কবিতায় বিপ্লব আর সেভাবে দানা বাঁধতে পারে নি । এ হল রাজনীতি-বিমুখতার কাল। এর মধ্যেও কবিতা রচিত হয়েছে, কবিতা যে হচ্ছে না তা নয় , এই দ্বিতীয় দশকে যারা কবিতা লিখছেন, তারাও এই রাজনীতি বিমুখতার ভেতরেই নিজেদের কবিতাকে তৈরি করে নিচ্ছেন। তবে জয় গোস্বামী, শ্রীজাত, সুবোধ সরকার,মন্দাক্রান্তা সেন , ফরহাদ মাজহার,,আকবর আলি খোন্দকার, ও আরও অনেকের কবিতায় আমরা সামাজিক প্রতিবাদ দেখতে পাই।

তবে এই দুই দশকে কবিতায় ঘটে গেছে অন্য এক বিপ্লব। টেকনোলজির বিকাশ কবিতাকে এনে দিয়েছে মানুষের হাতের মুঠোয়। কবিকে এখন আর প্রতীক্ষা করতে হয় না দীর্ঘ সময়কাল, কখন ছাপানো হবে, কখন পৌঁছাবে পাঠকের হাতে, কখন কেউ এসে বলবে, "খুউব ভালো লাগলো কবি"। একটা কবিতা লিখে কবি আর কী এমন চায় — নাই অর্থ, নাই প্রতিপত্তি — শুধু কেউ যেন কানে কানে বলে — ভালো লাগল, খুব ভালো লাগল। সেই দুটি কথা শোনার জন্য আজ আর প্রতীক্ষার প্রয়োজন নেই । এও এক মহা বিপ্লব । সেই জন্যই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পা ফেলে আমরা সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এক মহা বৈশ্বিক পরিবেশের। কবিতা তাই আবার নতুন কোন বৃহৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সুচনা করতে চলেছে ...এ কথায় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পরিশেষে বলি , কবিতা বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন শিল্প- সংস্কৃতি- সাহিত্য ,কোন না কোন শ্রেনী স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটা যেমন শোষক বা শাসকের জন্য সত্যি, তেমনই নিপীড়িত মেহনতি মানুষের জন্যও সত্যি।শ্রেনি সংরামের বিকাশের এক একটা স্তরে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটা খুব আশু কর্তব্য হিসাবে সামনে চলে আসে,তখন শিল্প – সাহিত্যকেও সেই বিশেষ স্তরকে ছুঁয়ে ,এমনকি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। বিপ্লব তো বিভিন্ন মুখি ,তাই বিপ্লব চলবেই আর কবিতাও তার হাত ধরে প্রবাহিত হবে অনন্তকাল ধরে।।

কৃতজ্ঞতা---

১.বিপ্লব ও বাংলা কবিতা----সম্পাদনা ,ফাল্গুনী দে, দে পাবলিকেশন্স

২.এই সময় ও জীবনানন্দ --সম্পাদনা, শঙ্খ ঘোষ,সাহিত্য একাডেমি

৩.bn bangla pria.org

৪.এম মঙ্গলধ্বনি ওয়ার্ডস ডট কম

৫.জয়ন্ত চৌধুরী--ফিরে দেখা-সত্তর দশকের কবিতার খন্ড আলোচনা ,অনুষ্টুপ

৬.শঙ্খ ঘোষ----কবিতার মুহুর্ত,অনুষ্টুপ

৭.নজরুল রচনা সমগ্র

৮.www.porobas .Com

৯.www.shodhadanga.flintiff .com

১০.অলোক বিশ্বাস -নয়ের দশকের কবিতা সম্বন্ধে।কবিতা ক্যাম্পাস

১১.সব্যসাচী দেব সম্পাদিত ---সমর সেন নানা কথা,অনুষ্টুপ

১২.সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত--বিষয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়----দেজ পাবলিশিং

(৭.৪.২০১৯ তারিখে কলকাতার শহীদ সূর্য সেন ভবনে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে বাংলা কবিতা ও বিপ্লব শীর্ষক বক্তৃতার অনুলিপি)

শুরুটা হয়েছিলো গুজরাট দাঙ্গা দিয়ে

আসাদুল্লা আল গালিব

শুরুটা হয়েছিলো গুজরাট দাঙ্গা দিয়ে, তারপর একের পর এক নানান রকম কারসাজি আর চক্রান্ত । যেমন বাবরী মসজিদ রাম মন্দির, CAA NRC, দিল্লী হামলা, নোট বন্দি, ডিটেনশন ক্যাম্প, মূর্তি বানানো, বিদেশ ভ্রমণ , মুসলিম হত্যা, গো মূত্র পান, গুলি চালাও স্লোগান, জয় শ্রী রাম, মব লিঞ্চিং, পরিয়ায়ী শ্রমিকদের স্যানিটাইজড করা, আরো কতই না কিছু ।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো আমি কেন এই সব লিখতে বসলাম ! আপনাদের প্রতি আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন। সত্যি করে ভেবে বলুন তো, আপনারা কি এদেশে ভালো আছেন ? প্রকৃতির দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারছেন ?

প্রথম দফার লকডাউন শুরুর আগেই আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আমরা সকলেই শুনেছিলাম । উনার থেকে যেমনটা আশা করেছিলাম তেমনটার কিছুই উনি বলেননি। উনার শেখা উচিত ছিলো অন্যান্য রাষ্ট্র নেতাদের কাছ থেকে। এই করোনার প্রকোপে তাঁরা তাদের দেশ কিভাবে চালাচ্ছে । কিন্তু আমাদের দেশের ফেকু প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শুধু শোনা গেল থালা বাটি বাজাও, ছাদে দাড়াও । অন্য দিকে করোনার আবহে বাংলার

আরেক সাংসদ তিনি বলে উঠলেন আমরা আগেও গো মূত্র খেয়েছি, এখনো খাবো । তাতে কার কি আসে যায় আর কার কি সমস্যা হলো তা দেখার আমাদের সময় নেই। ঠিকই আছে । সময় থাকবেই বা কেন। উনি বা উনার ভক্তরা গো মূত্র পান করুক , তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু মেডিক্যাল সাইন্সের দৃষ্টিতে কোন কথাটি সঠিক আর কোনটি বেঠিক সেটা একজন সাংসদের বুঝে বা জেনে বলা উচিত বলে আমি মনে করি ।

অন্যদিকে আমাদের দেশের হোম মিনিস্টার তিনি মনে করছেন যে সবাই কে মেরে ফেলবো। আর আমি একাই বেঁচে থাকবো। তা কখনোই সম্ভব নয় । মাননীয় মিনিস্টার বাবু আপনাকে দেশের জনগণ জানান দিতে চাই, আপনি দেশের হোম মিনিষ্টার। আপনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা আপনি মাটিতে মিশিয়ে দেবেন না । আপনাকে অবশ্যই অনেক গুলি বিষয় জেনে বুঝে ভাবনা চিন্তা করে সকলের সামনে বলা উচিত । আপনি ভারতের সিংহাসনে বসে আছেন বলেই যা খুশি তাই করবেন, তা কিন্তু আমজনতা মেনে নেবে না এবং তা হতেও দেবে না। জনগন আপনার কথা অতীতেও মানেনি, আর আগামীতেও মানবে না। বরং আপনাকে সকলে জিজ্ঞেস করতেই পারে যে আপনারও কাগজ আছে কিনা । দেশের আমজনতা আপনার কাগজ দেখতে চাইতেও পারে । শুধু আপনি দেখবেন আর দেখাবেন না, তা কি করে হতে পারে ?

বাংলার মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে আপনাদের মতো ফেকু মানুষের কোন

অবদান নেই। অবদান একমাত্র যার রয়েছে, তিনি হলেন মমতা ব্যানার্জী। ' জনতার কারফিউ' ঘোষণা করে দিলেই শুধু হয়না, মমতা ব্যানার্জীকে দেখে শেখা উচিত ছিলো আপনাদের । বাংলার নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর অবদান বাংলার মানুষের কোনদিনই ভোলা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনার প্রকোপে এবং আমফান ঝড়ে কোন কিছু সাহায্য বা অনুদান ঘোষণা করার পূর্বেই মমতা ব্যানার্জী জোগাড় করে ফেলেছিলেন পিপিই পোশাক, লক্ষ লক্ষ মাস্ক, ২০ হাজার থার্মাল গান, পর্যাপ্ত স্যানিটাইজ়ার, সেই সঙ্গে হাজার খানিক ভেন্টিলেশন সহ আরো অনেক কিছু। আর আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে জনতার কারফিউ ঘোষণার পরে বলে উঠলেন থালা বাজাও ঘটি বাজাও, আর কারেন্ট লাইন অফ করে দিয়ে মোমবাতি জ্বালাও। আপনার এই হাসির খোরাক দেশের মানুষ কোনদিনই ভুলবেনা । আপনি পরিযায়ী শ্রমিকের চোখের পানির দাম কোনদিনও দিতে পারবেন না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি দেশের মানুষকে মন দিয়ে ভালো বাসুন, যত্ন করুন। দেশ এগিয়ে যাবে । সম্প্রীতি বজায় থাকবে। এদেশ তো আমার আপনার সবার। স্বাধীনতার আগে যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করেছিলো হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম খ্রীষ্টান সহ সকল ধর্মের ভাই বোনেরা। তাদের রক্তের বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে । আর আপনি এই পবিত্র ভূমির সিংহাসন পেয়ে শুধুই করে যাচ্ছেন ধর্মের রাজনীতি !! এটা একদমই ঠিক নয় ।

করোনার কামড় ও মৃত্যুমিছিল থেকে রেহাই পেতে জনবহুল ভারতে আগে থেকেই জরুরী পরিষেবা গুলি চালু রেখে, বাকি সব পরিষেবা বন্ধ করে

দেওয়া উচিত ছিলো আপনাদের । কিন্তু তা আর করলেন কোই ?

কবির ভাষায় -

এটা জনতার কারফিউ নয়

যেন একটি লড়াই,

শ্রষ্ঠার কাছে বিনয় জানিয়ে

সৃষ্টির যেন বড়াই ।

বিশ্ব বলয়ের একটি অংশ

ভারতবর্ষ যার নাম

অহিংসার বলয় যেথা

ধর্ম যজ্ঞের ধাম ।

মানবতার শীর্ষে ভারত

কেন তার ছন্দ পতন ?

কেনই বা এতো বিশৃঙ্খলা

হারাচ্ছি মোরা সম্প্রীতির রতন ।

করোনা ভাইরাস বুঝিয়ে দিয়েছে যে বীনা যুদ্ধেও সকলকে ঘর বন্দি করে রাখা সম্ভব । সুতরাং এইখান থেকে আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, মহান আল্লাহ তায়ালা সব পারেন। একমাত্র উনি সর্ব শক্তিমান । তাই দেশবাসীকে অনুরোধ, আপনারা কখনোই এই নির্বোধ সরকারকে ভয় পাবেন না। আপনারা মনে রাখবেন যে তাদের পদ মাত্র সাময়িক। আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে । কিন্তু তাদের অত্যাচার বাংলার মানুষ, দেশের মানুষ কখনোই ভুলবেনা ।

আমি একজন আইনের ছাত্র হিসেবে মনে করি কোন দেশই তার দেশের মানুষদের ক্ষতি চাইনা। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ একটু বিপরীতমুখী দেশ । আমি এটাও মনে করি যে প্রতিটি দেশের সরকারের কাজই হবে এমন কোন আইন তৈরী করা, যে আইনে সাধারণ মানুষের লাভ হবে, সুবিধা হবে। কোনভাবেই যেন কারো ক্ষতি না হয়। আর আমাদের দেশের সরকার চাই সব সময় যেন আমার দেশের মানুষের ক্ষতি হয়, তারা যেন কষ্ট পেতে পেতে মরে যায়। এই কাহানী গুলি আমাদের চোখে পড়ছে, চোখে ভাসছে বলেই আজ বলতে সাহস পাচ্ছি।

লকডাউনের শুরুতেই মাননীয়া মমতা ব্যানার্জির একটি বক্তব্য শুনেছিলাম টেলিভিশনে। আমার স্পষ্ট মনে আছে সে দিনের বক্তব্য । তিনি বলেছিলেন,

আমি এই মুহুর্তে কি করে ঘরে বসে থাকতে পারি, আপনারা বলুন তো ! আমাকে গোটা রাজ্য দেখতে হবে। অফিস থেকে সব কিছু পরিচালনা করতে হবে । আপনাদের বলে রাখি মরলে আমি আগে মরবো, তবুও বাংলার একজন মানুষকেও এই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারিনা । আমি আমার জীবন দিয়ে বাংলার প্রতিটি মানুষকে বাচানোর চেষ্টা করবো।

আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আমাদের সকলকে আরো প্রতিবাদী হতে হবে । নিজের যোগ্য অধিকার নিজেকেই কেড়ে নিতে হবে।

একমাত্র ভারতবর্ষ এমন এক রাষ্ট্র, যেখানে পদ নিতে গিয়ে মারামারি আর খুনোখুনি। যেখানে শুধু মন্দির আর মসজিদের লড়াই । যেখানে শুধু গরীবদের মেরে ফেলার চক্রান্ত। আমাদের বুঝতে হবে। একটু বোঝার চেষ্টা করুন। চলুন না আমরা চোখে আঙুল দিয়ে তাদের দেখিয়ে দি যে এটা আপনার ভুল আর এটা আপনার ঠিক ।

কবিতা

পরিচিত এক হাঙর

আবু রাইহান

তোমার প্রতিউত্তরে অকস্মাৎ কেঁপে গিয়ে

হৃদয়ে বয়ে গেল আম্ফান

রাতের সব পথ বাতি নিভে গিয়ে

বন্দর শহর যেন শোকে মুহ্যমান!

বিক্ষিপ্ত জীবনতরী দিশাহীন

না পেয়ে প্রিয় হৃদয়ের জেটি

অকূলে ফেলে নোঙর,

অবিশ্বাসের ঘোলাটে ঘূর্ণি বাতাসে

তছনছ আজ মায়ায় গড়া ঘর,

আমার অস্তিত্বকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে

গিলে খাচ্ছে পরিচিত এক হাঙর!

ডুবে যাচ্ছে সব সম্পর্ক জলের গভীরে, গাঢ় অন্ধকার

জেগে আছে কেবল অনুভূতি ক্ষীণ, বুদবুদের আকার!

মানুষ তো দুঃখ পাওয়া একটি মুখ

গোলাম রসুল

শহর আত্মগোপন করে আছে

আর রাত্রির আকাশ কার্বণ পেপার

নক্ষত্রদের পোতাশ্রয়

বন্দরে ফিরছে পৃথিবী

ডেকের ওপর চারকোণ খোলা পর্দা ঠিক আমাদের অসুখের মতো

ফাঁকা মাঠ

সম্রাটের অনুভূতি

মধ্যযুগের আকাশ

আর আঙুলের মৃদু বাজনার সাথে আমি গান গাইছি

পৃথিবীর একটি অপরিচিত গান

আর চোখের ভেতরে বুড়ো হয়ে মরে যাচ্ছে আমার দৃষ্টি

সূর্য পেন্সিলের ভেতরে ছিলো

লিখেছে একটি বই

ঠিক আমাদের ভাগ্য যেমন

সন্ধ্যা হয়েছিলো বালির ওপরে মেঘ যেমন করে তৈরি হয় অসময়

তেমন কিছু নয়

মানুষ তো দুঃখ পাওয়া একটি মুখ

বাংলার লোকশিল্পী

নাজমুল হক

বড়ো দুঃখে আছে রে বাংলার লোকশিল্পীগণ।
বিনোদনের এই শিল্পীরা মজাতো শ্রোতার মন।
এখন গান ছাড়া কি করে বাঁচে শিল্পীর জীবন।।

বায়না নাই পত্তর নাই দিন কাটে ঘরে বসে।
কবি গানের আসর বসতো এই বৈশাখ মাসে।
গানের পানে আছি চেয়ে কবে গাইবো গান।
দিনের দেনা যাচ্ছে বেড়ে পেটে পড়ছে টান।
সব কিছু থমকে গেছে শুধু শিল্পী মনে সাইক্লোন।।

পালা গানের শিল্পী বাঁচে গম্ভীরা আলকাপে।
সময়ের এই বদল হলো বলো কার অভিশাপে।।
বারোমাসে তেরো পার্বন এটাই বাংলার রীতি।

আর লোকশিল্পী তুলে ধরে বাংলার সংস্কৃতি।

শিল্পীদের জন্য সবার কাছে করছি আমি নিবেদন।।

লোকশিল্পীর বেতন ও নাই নেই কোনো পেনশন।

আছে শুধু একটু সম্মান আর ভালোবাসার জন।

আনন্দ নিয়ে বাঁচে তারা আর আনন্দ করে দান।

কণ্ঠ শিল্পী গান ধরিলে যন্ত্রী যন্ত্র খান বাজান।

অভাবী হয়েও স্বভাবে শিল্পী এটাই হলো চিরন্তন।।

কোথাও হয়তো শিশির ঝরছে

মহম্মদ সামিম

কখনও কখনও স্মৃতিও হয়ে ওঠে

স্থলপদ্মের উপর চুঁইয়ে পড়া গোধূলির আঁচ,

আঙুল ছোঁয়ালে দৃষ্টিভ্রম কেটে যাবে

তাই, দাও উপশম, দাও বসন্তরেণুর ওম্

দুঃখের নিভৃতবাস শেষ করো আর

ফিরে এসো পলাশরাঙা সোহিনীগ্রামে।

ফিরে আসো নি কখনও,

অভিমানচূড়ায় থেকে গেছ একাকী,

এখনও বৃষ্টি পড়লে তোমার চোখ ফুলে ওঠে

নিজেকে বোঝাও, এই তো জীবনবোধ !

স্মৃতি আর শুশ্রূষার পরশ মেখে

অভ্যাস হয়ে যাবে এভাবে বেঁচে থাকার —

এই বলে সান্ত্বনা দাও নিজেকে...

ক্ষতচিহ্ন মুছে মুছে আমিও রোজ

শীতল মাদুর হয়ে শুয়ে থাকি দিনের শেষে,

কোথাও হয়তো শিশির ঝরছে, আর্তস্বরে।

সময়ের কড়চা

তাপস মাইতি

মানুষের কত জ্ঞান

তবু মানুষ শয়তান

বুদ্ধিতে দুনিয়াটা দলছে,

শিক্ষায় ছলা কলা

মেপে জোপে কথা বলা

এ ভাবেই সময় টা চলছে।

পাশাপাশি বসে ভাই

কত ভাব, মরে যাই

কত কথা এটা সেটা বলছে,

হঠাৎ শব্দ করে

এই বুঝি যায় মরে

দুজন দুজনকে দুষছে।

আভ ভাব এত ভালো

ভেতরে যে কত কালো

কিছুতেই বোঝা মোটে যাবেনা,

দুটো দিন পাশে বসে

জমাও গল্প কষে

এতটুকু আঁচ তুমি পাবে না।

হঠাৎ ই সেই লোক

পাকায় লাল চোখ

খোলা বাজারে লেগে যায় ঝগড়া,

কোথায় কি যে হলো

ভাই ভাই লেগে গেলো

নিয়ে শুধু এক তিল বখরা।

পড়াশোনা শিক্ষা

শেখায় যে ভিক্ষা

এত টুকু লোকশান যেন না হয়,

রাত জেগে ফাঁদ এঁটে

আইনের বই ঘেঁটে

যেন তেন বিচারে হোক জয়।

আদর্শ ছেঁদা কথা

আসলে যে দৈন্যতা

লাভ টুকু জীবনের শেষ পণ,

এভাবেই দিন কাল

চলছে যে চিরকাল

শয়তানী চলে যাবে আমরণ।

ভালো আর মন্দ

অতি দুর্গন্ধ

মানুষের চরিত্র বোঝা দায়,

নেতা হোক মন্ত্রী

সব ষড়যন্ত্রী

দেশটা বুঝি এবার যায় যায়।

পরবাসী

পিনাকী বসু

অসুখেতে কত লোক মরে,

ক্ষিধের কেন যে মরণ হয় না।

পরবাসী অবহেলাগুলোকে,

ওরা পরিযায়ী বলে ডাকে।

অকেজো শব্দগুলোর তাই বিশ্রাম নেই।

দীর্ঘ শ্বাসেরা, শরীরের জল মাপে।

অপচয়ের তরলে গা ভেজায়।

নতজানু জীবনেরা,

জীবনে প্রথমবার দামি ট্রেন চড়ে।

মেঘেরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়-

দুরে লেভেল ক্রসিং এ,

লাল আলো জ্বলে নেভে।

যেন কোন মৃত্যুর হাতছানি।

পথিককে পেরোতে হবে অনেকটা পথ।

অবাধ্য নিঃসঙ্গতারা শুধু,

মাঝপথে থেমে যায়।

মুঠোতে ধরা থাকে সময়ের দলিল।।

সেই'ত মাতব্বর

রফিকুল হাসান

কালেকালে কেউই কেউকেটা নয়

মহাকালের কাছে সবাই সমান হে

হাকিমের হুকুমে

সবার শিয়রে সমন!

তবু কেউকেউ ঢেউ তরঙ্গে হাবুডুবু খায়

ফেউ ফেউ করে ছুটে বেড়াই

সাময়িক সুখের আশায় আকারের পিছু

আশাহত সাকারের সারাটা জীবন!

দুকান কাটা হয়ে আখের গোছায়

আখেরতের কথা ভুলে

সটান কানে তুলো দিয়ে

ধূলো দিয়ে যায় লোকের চোখে

সাজসজ্জায় লাজলজ্জার মাথা খেয়ে

দুদিনের দুনিয়াদারীতে সেই'ত মাতব্বর!

ঘরে ফেরা

জ্যোৎস্না রহমান

বাইরে তালা, ঘরময় ছড়ানো যাপন।

টেবিলের একপাশে বসা অফিসব্যাগ

অভক্তিতে শুকনো মুড়ির মতো চিবোচ্ছে সময়।

ঠোঁটের ফাঁকে চ্যাপ্টা সিগারেটটি

একাকী চিমনির মতো উগরে দিচ্ছে বিষণ্ন ধোঁয়া

অভ্যাসের কাছে দাসত্ব স্বীকার করা ক্লান্তি

ল্যাদ খাওয়া জামায় ঘেমো গন্ধ খুঁজছে।

যে ছুটি, জড়ো করা বাহানার মধ্যে লুকিয়ে রাখত

কয়েক ঢোক অলসতা

সে আজ ঘরে বন্দী হয়ে মনে মনে ভাবছে,

ঘরে ফেরা হয়নি কতদিন!

বুলি

প্রদীপ্ত বর্মন

চারপাশে ঘুরছে বুলি- ছড়াচ্ছে নিউজ ভ্যান,

ভাঙছে কারুর ইমেজ আর করছে কারুর ফ্যান।।

ভরে যাচ্ছে আমার মগজ- মিশে যাচ্ছে রক্তে,

এইভাবে তো ব্যালটবক্স দিনের পর দিন ভরছে।।

না খেতে পাওয়া মানুষ গুলোর খবর কে ই বা রাখে,

ভোট ফুরোলেই লাশটা মেলে নদীর পচা পাঁকে।।

ভোট বাজারে গুম হয়ে যায় ছোট্ট মেয়েটি,

নেতার মুখে সহানুভূতির বুলির ফিরিস্তি।।

ঘুমন্ত চোখ

সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায়

অদ্ভুত একসময়ে হাঁটছি পথ,

খোলসে মোড়া তিক্ততায় শপথ।

মুখোশ পড়ে স্বজন পোষন ,

পথে পথে সর্তসাপেক্ষে... অনুদানের বন্টন !

একটা ব্যাপার খুব কমন,

উত্তাপের পরখ করতে থার্মাল গান,

হাতে মাখছি জীবাণু মুক্ত লোশন ।

গলায় গরল না নিতে হয় তাই সব সচেতন,

ভাবছি অমৃতের সন্ধানে এগোচ্ছে ক্রমশ জীবন ।

শহর জুড়ে হট্টগোল,

সকাল বিকেলে যোগ বিয়োগ নিয়ে ডামাডোল

সবশেষে মৃতুর পরে অস্তিত্ব হারিয়ে হচ্ছে শোরগোল!

তখন পর্দার পিছনে চলছে

একটা নাটক,

যার নাম "ঘুমন্ত চোখ"

আসলে...

ঘুমিয়ে থাকলে মন অস্থির হয় না !

শেষ সম্বল

দীনমহাম্মদ সেখ

আলোটা নিয়ে নিভিয়ে দাও

আমি এখন ঘুমাবো,

আমার মাথার কাছে পারলে কিছুক্ষণ বসো

আমি বড়ো নিঃস্ব, অসহায়।

একটাও প্রতিশ্রুতি নেই দেবার মতো

তবে আগ বাড়িয়ে ভালোবাসতে পারি

নিরঙ্কুশ ভাবে।

যদি তুমি চাও আমি আকাশও হতে পারি,

একটা মেঘলা আকাশ

তবে বৃষ্টি চেয়ে না

শুধু ভালো বাসা চেয়ো

এটাই আমার শেষ সম্বল

তোমাকে দেবার মতো।

ব্যবধান

সৌরভ আহমেদ সাকিব

এই পথ দিয়ে তোমার গল্পের দরোজায় যাওয়া যায়। এই বিবর্ণ রেলিং পেরিয়ে গেলে উঁচু-নিচু ঘর, বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এইসব তখনও ছিল, এখনও যেমন আছে।

এইসবের ভিতর তোমার গল্প রোদে পোড়ে, জলে ভেজে। বারোমাস এইসব দেখি। এখানে হতাশা নামের গাছটি ধীরে ধীরে মরে যায়। শোক জ্বাল দিতে দিতে নরম বুকও পাথর হয়ে ওঠে। তবু গল্পের পাতা ওলটানোর অভ্যাসে চোখ বুজে আসে। নগ্ন পায়ে এসে লাগে জলের বিদ্রুপ, আর তোমার গল্প ছায়ার মতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যায়।

বাক্যহারা এক মানুষের মতো সে গল্পের পাশে হাঁটু মুড়ে পড়ে থাকি। এইসব গল্পের ভিতর আমাদের সঙ্গম-স্পৃহা ছিল, নান্দনিক আগুনেরও আভাস ছিল। সে-সব তীব্র ইচ্ছা, নিহত অক্ষরের মতো পুড়ে গেছে কবে...

এখন শুধু বাতাসে ছাই ওড়ে,

গন্ধহীন...

আর ক্লেদহীন শরীরে ভিড় করে বিকেলের আলো...

করোনা

কবীর হোসেন

করোনা তুমি চলে যাও,

তুমি ফিরে যাও,

আবারো ব্যাস্ত হতে দাও,

এই স্তব্ধ পৃথিবীটাকে

কেন এসেছো?

প্রকৃতির হয়ে বদলা নিতে

বুঝিয়ে দিতে এসেছো

মানুষের লুকান্নিত পাপ

তুমি থামিয়ে দিয়েছো

হিংসা, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব.

বাড়িয়ে দিয়েছো,

হতো দরিদ্রের দারিদ্রতা

এই পৃথিবীটাকে

বাড়িয়ে দিয়েছো মৃত্যুপুরী,

কেড়ে নিয়াছো

প্রিয় জনেদের!

করোনা তুমি চলে যাও,

তুমি ফিরে যাও

বিনীত নিবেদন

এই বিশ্ববাসীর।

মহাপ্রলয়ের পর

জয়নূল আবেদীন

কেতাবে বর্ণিত মহাপ্রলয় নয় বটে

তবে দৃশ্যত মহাপ্রলয়ই,

মহানগরীর গাছপালা উল্টে রাস্তায়

বহুতল বহাল তবিয়তে থাকলেও

দারিদ্র্যের ঐতিহ্যবাহী কাঁচা বা

আধপাকা বাড়িগুলো ধুলিস্যাৎ।

বহুতলবাসীরা নেট-বিদ্যুৎ বিহনে

বিধ্বস্ত, বিরক্ত, দিশেহারা।

তার মধ্যে কারও সুযোগ হতেই

বিধ্বংসী চিত্রের পোস্ট

তাতে লাইক, ভেরি নাইস ইত্যাদি

কমেন্টের ছড়াছড়ি!

দক্ষিণী গ্রাম,গঞ্জ,আধাশহর

অবয়ব হারিয়ে ধ্বংসস্তূপ

অতি কষ্টে গড়া টিনের চালাঘর

উড়ে গেছে অজানা ঠিকানায়।

বাঁশ-টালির ঘর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে,

তার তলায় কোথাও প্রাণহীন মানুষ

কোথাও বা গবাদিপশুর লাশ!

উল্টে গেছে পান্তাভাতের হাঁড়ি

চাল-ডাল-নুন চাপা পড়ে স্তূপে

একটা বিস্কুট, দুটো মুড়িও জুটছেনা

খাবার জলটুকুও মিশে গেছে

জলোচ্ছ্বাসের নোনা জলের স্রোতে।

মহানগরীর একজন সংযোগ পেলেন

জানালেন, স্বনির্ভর হয়ে উঠতে

ফ্রীজে জমানো স্বাদু খাবার

তিনদিন ধরে খেয়েও শেষ হয়নি

নষ্ট হলো বিস্তর। আফসোস!

ক্ষোভে ফুঁসছেন বিভাগীয় ব্যর্থতায়।

সোনা সেখ, হারু দাস, বিদ্যুৎ কর্মী

গালাগালে তাদের গুষ্ঠি উদ্ধার,

ওরা নিখোঁজ সেই উনিশ তারিখ থেকে --

ছুটি বাতিল, নেট বন্ধ, ফোন অচল

পরিবার উদ্বিগ্ন। তারাও। নির্ঘুম রাত

শরীর অসাড়-প্রায়, তবু চরৈবেতি!

মিডিয়ার পন্ডিতেরা আঁতিপাঁতি করে

খুঁজে চলেছেন বিপর্যয়ের ইতিহাস

একশো-দুশো বছর ছাড়িয়ে

তাঁদের প্রখর দৃষ্টি পৌঁছে যাচ্ছে

খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের দিনগুলিতেও!

হাসীম সেখ, রামা কৈবর্তরা

কৌপীন, নুনভাতের সন্ধানে দিশাহীন।

আমরা বিক্ষোভে পথে নেমে পড়েছি

বিদ্যুৎ, অন্তর্জালের দাবিতে,

ওরা এখনও পথে নামতে পারেনি

পথটাও যে হারিয়ে গেছে ওদের!

ইচ্ছামতী

নাসরিন নাজমা

উপত্যকার বুকে জমে আছে সময়ের দাগ

ক্ষত ছুঁয়ে নিকষ আঁধার আজও জমে

নোনা ধরা পাথরের খাঁজে।

এপারে কুয়াশা ঘন, ওপারেও ছায়া ছায়া মেঘ

ধূসর আলোয় ঢাকে জ্যোৎস্নার মায়ার শরীর।

একদিন স্রোত ছিল উজানের গাঙে

জল ছুঁয়ে দর্পণ এঁকেছিল কার চেনা মুখ।

অবয়ব জুড়ে অমল আলোয় মাখা প্রেম

শুধু অস্ফুটে দিয়েছিল অজানায় ডাক।

বলো কার দোষ ছিল, কার অপরাধ কত বেশি?

উত্তর মেলেনা কিছুই

প্রেমহীন কাঠামোটি মুখ গুঁজে শুধু

পড়ে থাকে ভাসানের শেষে

প্রত্যাখ্যানে জমে হিমবাহ হাজারবছর।

পাষানী অহল্যা, কত শোক বুকে বেঁধে বলো চুকে যাবে শপথের দাম,

হারানোর আর কী বা বাকি?

ইছামতী এবার তো চেয়ে দেখ মানবীর চোখে,

কানাকড়ি হিসেবেরও শেষে

একবার ছিঁড়ে ফেল কুয়াশার জাল

দেখ

বুকের ক্ষত জুড়ে ব্যথা নয়, বয়ে যাবে প্রেমের নদী।

প্রেম

রাজকুমার শেখ

এ শহরে আমি রাজা

ভিখিরি ও বটে

মন চায়লেই হাত রাখি নদীর বুকে

অল্প জল

মন ছোঁয় না

ভেজে না প্রাণ

মেয়েটিকে একশ একবার দিব্যি দিয়েও

সে কখনও সত্যি বলে ফুল দেয়নি হাতে।

রাজা হলেও

সে একদিন ভিখিরি হবে

প্রেমের কাছে।

রোগ

নীলয় বাগচি

না রাগ নেই কোনো রাষ্ট্র তোমার জন্য,

হতাশা পিঠে বয়ে বাড়ি ফিরে এলো অনেকেই,

কাদের ক্ষুধার পথ মাড়িয়ে দিয়ে গেল সভ্যতার চাকা,

এ সমাজে এখনোও দরিদ্র ও ধনবান আছে,

কি বোকা মানুষ এরা রেললাইন ধরে বাড়ি ফেরে,

জানেনা এ সমাজে এখনো অস্পৃশ্যতা আছে,

পিষে দিয়ে যাবে চাকা, পিষে দিয়ে যাবে রেলগাড়ি,

কিন্তু কি অদ্ভুত জেনো, অস্পৃশ্যকে ছোঁবেনা ছোঁয়াচে রোগ।

জীবন

উম্মে সালমা

এ জীবন জীবন্ত ময় উচচ্ছোসর মত।

উচ্ছিসত পথে হাটতে গিয়ে অন্ধকারে মনে হয় এই একাকী পথে, আমি এক অজানা পথিক।

এই একাকী পথে হাটতে বড্ড ভয় করে,

ভাবী আমি কি বিলিন হয়ে যাবো।

এই একাকী পথের বাঁকে, এই পথ চলা শেষ না হতেই, আমি কি শেষ হয়ে যাবো?

এই পথ টা যদি মসৃণ হতো,

এত কন্টক না থাকত,

আমি ঠিকই পারি দিতাম,

আমার সেই স্বপ্নের দেশে।

হে ঈশ্বর, তুমি শুনেছ কি?

নূর - এ - সিকতা

হে ঈশ্বর, তুমি শুনেছ কি?

ভদ্র পল্লির ক্ষুধার্ত শিশুর বুকভাঙ্গা কান্নার আওয়াজ, অসহায় মায়ের নির্মম আহাজারিতে উত্তাল আকাশ-বাতাসের সকরুণ প্রতিধ্বনি।

শুনেছ কি?

শুনেছ তুমি! ভয়ার্ত নদীর দু'কূল ছাপিয়ে আছড়ে পড়া ভয়াঙ্কর ঢেউয়ের কলরব

ভেঙ্গেচুরে সুনসান নদী পাড়ের আবাদী জমি, ঘর।

সর্বস্ব হারিয়ে বোবা আর্তনাদে কম্পিত করে এই ধরার মৃত্তিকাতল?

দেখেছ তুমি কি? হে ঈশ্বর,

ঐ অভিশপ্ত যৌনপল্লির রং পাউডারে মাখা শত শত চোখের স্বপ্ন পুড়ে খাক হওয়া,

স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে থাকার তীব্র বাসনায় কিভাবে পতিত হয় হায়েনাদের

কাম-লালসা জল।

প্রত্যেক রাত্রি জানে, কিভাবে নোনা জলে ভিজে যায় বিছানা-বালিশ? শাড়ির আঁচল সাক্ষী গোপনে মুছে কতশত ঝরে পড়া জল।

তুমি জানো কি?

কন্যাদায় গ্রস্ত পিতার সুখস্বপ্ন কিভাবে যৌতুকের কাছে নিরবে বলি হয়?

একটু একটু করে রক্ত-ঘামে জমানো অর্থ- সম্পদ, বুকের পাঁজর আর স্নেহ দিয়ে রক্ষাকৃত আদুরের কন্যাকে অপরকে তুলে দিতে কেমন কষ্ট হয়?

হে ঈশ্বর,

তুমি শুনেছ? সেই কাঁন্নার আহাজারি, বুকফাটা আর্তনাদ।

রক্ত-মাংস ক্ষয়ে তৈরি করা শেষ সম্বলে

শকুন -হায়েনাদের জোর,জবরদস্তি পদচারণার আনন্দের বিকৃত উল্লাস।

নিজের সম্পদে নেই নিজের ভোগ দখলের অধিকার।

হে ঈশ্বর, তুমি জানো?

এক সম্ভ্রম হারানো কুমারী মেয়ের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা,

সন্মান হারিয়ে তিলে তিলে মরেও বেঁচে থাকার শ্বাশত লড়ায়ের ইতিহাস,
অপরাধ না করেও অপবাদ কাঁধে নিয়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদার নির্মম পরিহাস।

হে ঈশ্বর তুমি ক্যামনে চুপ রও!

যখন ক্ষুধার্ত গরীব,কাঙ্গালের পেটে লাঠি মেরে তাদেরই খাবারে ভাগ বসায় সেবক নামধারী ইতর শ্রেণীর শোষকের দল।

যারা কাঙ্গালের চেয়েও কাঙ্গাল, গবীরের চেয়েও গরীব ইতর জাতি, ক্যামনে ভাব ধরে সাজে জনসেবক, জনপ্রতিনিধি

যখন গিলছে গরীবের খাবার, কাঙ্গালের হক টুপটাপ।

হে ঈশ্বর, তুমি শুনেছ কি?

খুরশিদ আলম এর দুটি কবিতা

বদ্বীপ

ভয় কিভাবে পাহাড় বুনছে

একটা দুটো পটকার আওয়াজে

নিজেকে কেমন দূর্বল অসহিষ্ণু মনে হয়

আইসোলেশন শব্দটি আদৌ কখনও একা কিম্বা একাকী হতে পারে না

বিষাদের ভেতর তীব্র কোনো হাহাকার,

সুখ-অসুখ সেখানে নিজস্ব ছকে মেলে না

বড্ড মায়া মায়া লাগে,

ম্যাজিকের মতো অপূর্ব কিছু ছুঁতে চায়

গণিত আর ইতিহাসের মধ্যে যে তফাৎ -

ভাবলেই নদীও ক্রমশ বদ্বীপ হয়ে ওঠে,

লুডো অথবা সাপ

চোখ আর কান ক্রমশ পৃথক হয়ে যাচ্ছে

যেভাবে পাখি এবং পরিযায়ী

শিয়রে ধ্বংস আঁকছে নদী অথচ এখানে সব্বাই কেমন জানি মিত্র -মিত্র ভাব

আমিও তীব্রভাবে খেলতে চাইছি লুডো অথবা সাপ

শূন্যদর্শকাসনে বসে আছে কিছু চতুর বেড়াল,

আমাকে ঠান্ডা হতে শেখায় নরম হতে শেখায়

ভাবি এভাবেও কি বুদ্ধির বাজারে বিক্রি হয় ঘুম!

পাথর আর জল এক হয়ে গেলে

শ্লা, আমি কেমন বোবা হয়ে যাই

মায়ের আর্তনাদ

ফারুক হাসান

মেঘ ডাকে কড় কড়,

বৃষ্টি বুঝি আসবে জোরে

মায়ের মন কাঁদে

ছেলে নাই তার ঘরে!

কোথায় আছিস কতদূরে

আয়রে সোনা মায়ের কোলে! দিশাহারা প্রাণ করে আনচান,

কেন এলি না এখনও ফিরে, পুকুরে ব্যাঙের ডাক বাইরে

বৃষ্টির শব্দ শুধু মায়ের আর্তনাদ নয় কোন পদ্য!!

এই বুঝি এলো ঝড় ওই এলো বৃষ্টি, মন শুধু ভয়ে মরে হবে কি অনাসৃষ্টি!

বৃষ্টিতে যদি ভিজি, মন তবু শান্তি খুঁজি, সবাই যদি থাকি একসাথে! বৃষ্টি শেষে সোনা এল পাখি যেন নীড় পেল,

অন্ধ ফিরে পেল তার দৃষ্টি!!

প্রতিপক্ষ

মাহমুদুল হাসান নিজামী

যাহাদের পক্ষে আছি তাহারাও

ভাবে প্রতিপক্ষ আমায়

কারন আমি এখনো

তোষামোদী শিখিতে পারি নাই ।

আমার বিবেক এখনো হতে পারেনি

দল অন্ধ কারাগার

তাইজন্য সত্যবাদী সর্বদা

প্রতিপক্ষ হয়ে যায় সবার ।

মৌলভী কয় আমি নাস্তিক

শয়তান কয় মৌলবাদী

হতে পারিনি হামি কোনটাই

বিবেকের প্রহরী সত্যবাদী ।

কেহ কেহ শেখাতে আসে

কেহ শুধু শিখিতে চায়

সস্তা জ্ঞানে বস্তা বিতরন

এতো ধৈর্য্য আমাতে নাই।

থামনা এবার

হাবিবা খাতুন

এবার একটু লাগাম টান, ওই -

অনেক তো হল মৃত্যু মৃত্যু খেলা -

মুছেদেনা একমুখি পদচিহ্ন

নির্ভৃতে মিটে যাক ঘৃণার ইতিহাস।

থামনা এবার, এবার একটু লাগাম টান।

অন্ধগলিতে ফুটে উঠুক হাসনুহেনা, করবী,

উঠে যাক দমিয়ে রাঙা আকাশসম যন্ত্রণা,

স্পর্শী প্রকৃতির ছোয়ায় সেজে উঠুক ধরিত্রী,

থাম থাম, থামনা এবার,

এবার একটু লাগাম টান।

বিষণ্ণ রাত, আস্ফালন দিন নীরবে কেঁদে চলেছে -

ঝরনার গান, পাখির কূজন থমকে গেছে;

বসন্ত বাহার, ককিলের কেকা বড় বেমানান।

অনেক হয়েছে, থামনা এবার!

এবার একটু লাগাম টান।

রামধনুর রঙে রাঙিয়ে যাক পৃথিবী,

কেটে যাক যন্ত্রণায় কাতরানো রজনী,

শুরু হোক দ্বারে দ্বারে পুষ্পাঞ্জলি।

থাম থাম। থামনা এবার!

এবার একটু লাগাম টান।

নগ্নতা

সুদীপ্ত বিশ্বাস

রাতের কাছে নগ্ন হতে লজ্জা তো নেই;
বরং ও রাত ঘন কালো চাদর মুড়ে
ঢেকে রাখে আমার যত নগ্নতা সব।

ওই আকাশে নগ্ন হতে লজ্জা তো নেই;
বরং আকাশ ছাতার মত মাথার উপর
মুড়ে রাখে সবকিছু তার বুকের ভিতর।

জল বাতাসে নগ্ন হতে লজ্জা তো নেই;
বরং তারা একটু বেশি খুশি হয়েই
ফিসফিসিয়ে বলে কিছু বাড়তি কথা।

নদীর কাছেও নগ্ন হতে লজ্জা তো নেই;
বরং নদী ছলাত-ছলাত ছন্দ তুলে
নগ্ন হয়েই আমায় শুধু নাইতে বলে।

বন-পাহাড়ে নগ্ন হতে লজ্জা তো নেই
বরং তারা খুব খুশিতে দুজনেই চায়
আমি যেন খালি পায়ে যাই হেঁটে যাই।

পশুপাখি ওদের কাছেও লজ্জা তো নেই;
বরং তারা বন্দুক আর চশমা-টুপি
এসব ছাড়ায়, সত্যি কোনও বন্ধুকে চায়।

এই পৃথিবীর সত্য যারা তাদের কাছে
নগ্ন হতে লজ্জা তো নেই,লজ্জা তো নেই
কারণ সত্য নগ্ন হতে লজ্জা পায় না।

মানুষ দেখে নগ্ন হতে লজ্জা করে
মানুষগুলো লুকিয়ে রাখে নিজের মুখও
তারা শুধুই মিথ্যে বলে, মুখোশ পরে।

এই সমাজে নগ্ন হতে লজ্জা করে
গোটা সমাজ মিথ্যেবাদী, ভ্রষ্টাচারী
নগ্নতা আর সরলতার সুযোগ খোঁজে।

খই

সুরাত আলি

ছড়াচ্ছে খই রাস্তা দিয়ে,

শ্মশানে কার দেহ নিয়ে;

তুলছে কারা রব,

যাচ্ছে নিয়ে শব;

চার জনাতে ধরে খাঁটি,

যাচ্ছে তারা নীরব হাঁটি;

বাজছে নাকো ঢোল,

বলো হরি বোল!

অথচ আজ সকাল বেলা,

খেলছিল সে দারুণ খেলা;

মুখে ছিল হাসি,

মুক্ত রাশি রাশি;

দুপুর বেলা মাছে ভাতে,

বসল খেতে মায়ের সাথে;

ছিল হাসির রোল,

বলো হরি বোল!

মাছের মুড়ো দেবে মুখে,

এমন সময় কাহার ডাকে;

খুলতে গেল দ্বার,

বন্ধু ছিল চার;

চার বন্ধু বলল তাকে,

যেতে হবে তাদের সাথে;

থাকলো মাছের ঝোল,

বলো হরি বোল!

চার জনাতে সঙ্গে নিয়ে,

বাহির হলো দরজা দিয়ে;

মুখে ছিল কথা,

সুখের কথকতা;
বেরিয়ে গেল খোশ মেজাজে,
মায়ের বুকে ঘন্টা বাজে;
দোলনা দিলো দোল,
বলো হরি বোল!

দুপুর যখন গড়িয়ে গেল,
মায়ের চোখে জল এলো;
চিন্তা এলো চলে,
কর্ম গেল ভুলে;
ভাবছে মায়ে ছেলের কথা,
চিন্তাতে তার ঘুরছে মাথা;
নাইকো হাসির টোল,
বলো হরি বোল!

অবশেষে ধীরে ধীরে,
আসলো তারা বাড়ি ফিরে;

খোলাই ছিলো দ্বার,

বন্ধু ছিলো চার;

সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা,

ছিল কাহার দেহ রাখা;

ভাঙ্গলো বুকের খোল,

বলো হরি বোল!

মায়ে কাপড় তুলে দেখে,

সারা দেহ রক্ত মেখে;

উঠলো কেঁপে বুক,

উধাও হলো সুখ;

কান্না মায়ের আসলো নেমে,

সারা শরীর আসলো ঘেমে;

শূন্য হলো কোল,

বলো হরি বোল!

যারা ছেলের বন্ধু ছিলো,

দেহে ফুল ছড়িয়ে দিলো;

দিলো ধূপের বাতি,

যারা ছিলো সাথী;

ভাঙলো সকল সুখের হাট,

চলল নিয়ে শ্মশান ঘাট;

মুখে একই বোল,

বলো হরি বোল!

ছড়াচ্ছে খই রাস্তা দিয়ে,

শ্মশানে সেই দেহ নিয়ে;

তুলছে তারা রব,

যাচ্ছে নিয়ে শব;

চার জনাতে ধরে খাঁটি,

যাচ্ছে তারা নীরব হাঁটি;

বাজছেনা তাই ঢোল,

বলো হরি বোল!!

(বি:দ্র: ছন্দের প্রয়োজনে কিছু ভাষাগত ত্রুটি হয়েছে)

ওরে বোকা সমাজ রে

হামিম হোসেন মণ্ডল (বুলবুল)

ঘাম ঝরা দুপুরে বন্ধু তুমি আসরে!

তপ্ত পথ পায়ে ঠেল সমাজ যে ঘুমায়রে।

গৃহছাড়া তুমি মেয়ে - হবে আমার বধূরে?

নিরলস তোমার চাওয়া, শূন্য হাতে বাসরে।

গুরুদেবের মন্ত্র শোনো, ওরে আমার সোনারে!

সমাজে আজ হিংসাবৃতি - ছড়িয়েছে তার রেশ,

তোমার আমার হৃদয় মাঝে রাখবো না তার শেষ।

চারিদিকে হানাহানি, কাটাকাটি আর মারামারি,

আকাশের চেয়েও বিশাল হবে আমাদের এই জড়াজড়ি।

পিশাচদের চোখ টাটিয়ে যাবে,

কুৎসিত সব হারিয়ে যাবে,

শীতের আনন্দ ছড়িয়ে যাবে -

সবার মনে যুগল প্রাণে।

জারা সোমা এর দুটি কবিতা

কলম

লেখার অছিলায় সহ্য করেছি স্বেচ্ছাচারিতা

স্মৃতির রঙীন ক্যানভাসে জমে ধুলোর আস্তরণ

হারিয়ে যাওয়া শব্দ গাঁথে না জয়মাল্য।

দহন-দুঃখ যাপন-অবহেলার সাক্ষী কেবল

শুকোনো রঙ ও মৃত কলম।

গুমনাম

নিজের লেখাগুলো দেখলেই চমকে উঠি
যেন রোজনামচার বিবরণ ডাইরি।

শব্দগুলো ছুঁলেই চাগাড় দেয় বেদনা
যতিচিহ্নে মিশে থাকা দীর্ঘশ্বাস।

প্রেম শব্দটা ক্রমশ ক্লিশে হচ্ছে ক্রমশ।

মধ্যবয়সে আচমকা আসে কালবৈশাখী
নিরাপত্তাহীনতার ভয়ে কুঁকড়ে যাই শামুকখোলে।

কবিতা লিখতে গেলেই উঠে আসে
সংসার আগুনে জ্বলন্ত মেয়ের বাসনা

পেটের খাঁজে জমা হয়

অবাঞ্ছিত গুমনাম মেদ রাশি ।

আজও ভালোবাসি

রাজেশ পাল

তোর কুঁচকানো ভ্রুকুটি,

খোঁজে আবেগের বিষ

তোর ভালোবাসা যদি তুই খুঁজে নিস

আমি ছন্দে ভরে দেবো

গন্ধে ভরে দেবো রজনী

যদি একবার ফিরে আসতিস।

ছুতাম তোর দেহ

গন্ধ নিতাম তোর

তোর বুকে মাথা রেখে

দেখতাম কত ভোর।

আবেগ রাশি রাশি

আমি আজও ভালোবাসি,

তোকে!

আজও তোর বাস

আমার মনের প্রতি বাঁকে।

আধুনিক সভ্যতার বিশ্ব

মার্জিনা খাতুন (এঞ্জেল)

হ্যাঁ! এটাই আধুনিক সভ্যতা

যার চারিদিকে শুধুই হাহাকার,

হ্যাঁ! এটাই বর্তমান বিশ্ব

যার দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে অনাচার,

এখানে আমি আপনি এইসব

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব

আর উপভোগ করব

কিন্তু কিছুই করতে পারবো না

কারণ এটাই সভ্যতার বিশ্ব

যার ডাক নাম মুখ বন্ধ।

এটাই এই অন্ধ পৃথিবীর আইন কানুন

আপনি সব দেখবেন, আর চুপ থাকবেন

তাহলেই আপনি ভালো থাকবেন।

নইলে এই সভ্য সমাজের সভ্য মানবকুল

আপনাকে বিষাক্ত ছোবল মারবে

পদে পদে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে,

আপনি নিছকই একটা তুরূপের তাস।

এই সভ্য সমাজের রঙ্গ তামাশার মাঝে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাজার হাজার

অসভ্য মানব জাতির ক্ষুধার্ত কঙ্কাল।

তারা হয়তো আজও কাঁদে,

এক মুঠো খাবারের জন্য চিৎকার করে

বলতে থাকে হে অন্ধ পৃথিবী,

আমরা কি দোষ করেছিলাম যে

মৃত্যুর পরে আজও আমরা ক্ষুধার্ত।

হ্যাঁ! এটাই আধুনিক সভ্যতার বিশ্ব

হ্যাঁ! এটাই মুখ বন্ধ সভ্য মানব জাতির নিদর্শন।।

নিদ্রার দেশ

ইব্রাহিম বিশ্বাস

আমি হেঁটে হেঁটে পার হচ্ছি

একটি মৃত সভ্যতা

চার পাশে অসংখ্য লাশ

সম সম শব্দ শুনতে পাচ্ছি

চিল শকুনের ডানার ঝাপট

বাতাস বিভৎস গন্ধ

প্রতিটি ঘরের দেয়াল থেকে ভেসে আসছে

আর্তনাদ

এখানে আর কারো কাছে সমবেদনা নেই , যে

সস্তাই খরচ করবে

নদীর পাশে দাঁড়ালে মাছেদের কান্না শুনতে পাই

সব মাছেরা বন্ধ্যা হয়ে গেছে

পাখিদের কলরব নেই

এখানে সবার চোখে গভীর থেকে গভীর ঘুম

আমার বিনিদ্র পদ ধ্বনিই

তাদের ঘুম ভাঙেনা

আমি সমস্ত নীরবতা ভেঙে একটা একটা পা ফেলে

পার হয়ে যাচ্ছি এ নিদ্রার দেশ।।

ইচ্ছেমতো

মহম্মদ আলামীন

রেডিওর জায়গায় এখন রেডিওঅ্যাকটিভ

তাই পথেই নাচি ইচ্ছেমতো

ডিজে, তাসা বড্ড খাসা।

পানের দোকানে ধুমপান করি,

পান করে ফিরি ঘরে।

ইচ্ছে হলে স্বচ্ছ ভারতের দেয়ালে প্রস্রাব করি

দার দাঁড়ায় অচেনা কোনও দ্বারে।

মন চাইলে মূর্তি ভাঙি ফুর্তি করি

রাস্তাঘাটে শ্লোগান ঝাড়ি

রোয়াকে বসে গনতন্ত্রের বুলি কপচাই

ধৃতরাষ্ট্র পাতে কেবল আড়ি।

মৃতের আবার জাতবিচার কী!

রাকা ব্যানার্জী

এক টুকরো মাংস পেলেই

তাকে ভাজা ভাজা করি

মিনিট অথবা সেকেন্ড সেখানে বেপরোয়া

পোড়া মাংস দেখলেই

শুরু হয় দহন

যেন এক খাবলা হৃদপিণ্ড

পড়ে আসে আধপোড়া অবস্থায়

তবুও দাম্পত্য ও দাসত্ব প্রতিদিনই

চেটেপুটে খায় মাংস

দিঘি

হাবিব মণ্ডল

ঘৃণা দাও, ঠেলে দাও দূরে, যতই ছুড়ে দাও অবহেলায় উচ্ছিষ্টের মতো।

ঘাসের মতো ঢলে পড়ব, পোষা বকের মতো ফিরব প্রিয় দিঘির জলে।

তখন তুমি পারবে তো ফেরাতে!

ইচ্ছে হলে ফিরিও, পরোয়া করি না।

মনের পানি দিয়ে বুনেছি ভালোবাসার তৃণ।

এর মৃত্যু হবে না জেনো রোদ-ঝড় কিংবা মারণ-অসুখে।

আলোচনা শেষেও নীল রঙ

সম্পা পাল

আমি লাল রঙ বেছে নিয়েছি

নীল কিন্তু তোমাকে মানায়

এখন একটু বিরতি নিচ্ছি

টেলিভিশনের পর্দায় এখন জীবন বনাম জীবিকার আলোচনা

তারপর আমি কিছুক্ষণ ভাববো

সাইকেলে পাতা সংসার আর কতক্ষণ চলবে ?

কিংবা মৃত মায়ের চাদর টেনে নেওয়া শিশুর শৈশব

তবু কখনো কখনো উদাসীনতা কাছে আসে

আমি হয়তো আর একটু সাহসী হতে পারতাম

সব আলোচনা শেষেও

নীল রঙে তোমাকে ভালোই লাগে

অন্যরকম

পার্থসারথি সেনগুপ্ত

কিছু ব্যতিক্রমী অবকাশ হয়

যা ব্যস্ততার থেকেও কঠিন

কিছু আড়মোড়া ভাঙা রোদ

বেলা গড়িয়ে গায়ে পরে

তবু চাদরে একরাশ বিরক্তি

সুনামি র অসহায়তা র কাছে

সীমান্ত যুদ্ধ শ্রেয় বলে মনে হয়

কিছু অসহায় বাইরের দৃষ্টি তাকিয়ে থাকে

ঘরের ভিতরে আমার সুস্থতার দিকে

আজ ঘরের দেওয়াল সত্যি প্রাচীর তুলেছে

একই ঘরে নিজেকে ভীষণ আলাদা মনে হচ্ছে

জীবন আজ মুখ ঢাকছে

মৃত্যুর ছায়া সরাবে

কাজ হারাল যারা

মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি

'করোনা'র এই দু:সময়ে কাজ হারাল যারা
ভাবতে গেলেই কষ্ট পাই কোথায় যাবে তারা?

ভিন রাজ্যে গিয়েছিল একটু কাজের তরে
আকাশ ভেঙে তাদের মাথায় বাজ গিয়েছে পড়ে।

থাকার স্থান হারিয়ে গেছে, পথ হয়েছে ঘর
চেনা পৃথিবী হঠাৎ যেন হয়েছে গিয়ে পর?

গাড়ি-ঘোড়া চলছে নাতো সব আটকে আছে
জানেনা তারা কিভাবে যাবে প্রিয়জনের কাছে।

মুখের কাছেও খাবার নেই বড়োই অসহায়

প্রাণটুকুকে হাতে নিয়েই তবুও হেঁটে যায়।

জানে না তারা কবে পাবে আপনজনের দেখা
করোনার ভয় তাদেরও যে করেছে ভীষণ একা।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বহু প্রাণ
এখন তাদের কে শোনাবে আশ্বাসেরই গান!

বড়ো করুণ এই দৃশ্য তাকানো না যায়
যাচ্ছে ভেঙে বুকের পাঁজর নিদারুণ সে ব্যথায়।

স্বাধীনতার এত পরেও ভাবিনি তাদের কথা
বন্ধু হয়ে শুনিনি তাদের আর্তি-আকুলতা।

আলোর নিচে অন্ধকার বেরিয়ে পড়ে তাই
প্রশ্ন যদি করি তোমায় উত্তর আজ নাই।

ঝাঁ-চকচক এই পৃথিবী এদের হাতেই গড়া

সহৃদয়ে রাখিনি খোঁজ এদের বাঁচা-মরা।

এসো বন্ধু, এসো এখন এদের কথাও ভাবি

এই সময়ে পাশে দাঁড়াই খুলে মনের চাবি।

জীবন প্রবাহ

পাভেল আমান

স্তব্ধ জীবন বদ্ধ ঘরে

লকডাউনের প্রহরগুনে

উড়ু উড়ু মনটা করে।

ফেলে আসা স্মৃতি বুনে।

নির্জনতায় গুটিয়ে রাখি

অনুভূতির সব শব্দমালা

উড়িয়ে দিয়ে প্রাণের পাখি।

খুলতে থাকি মনের তালা।

নির্ভরতার সহজ পাঠে

রুদ্ধ জীবন ভাষা খুঁজে

দুনিয়া জুড়ে মাঠে ঘাটে।

চলতে থাকে জেনে বুঝে।

ধৈর্য সীমার ছত্র ছায়ায়

কাটাই জীবন নিভৃত বাসে

বিপর্যয়ের দমকা হাওয়ায়।

জীবিত আছি প্রাণের শ্বাসে।

চারিদিকে শুধুই অস্থিরতা

এসেছে নেমে ভয়াল আবহ

সরে যাবে যত অসারতা।

বয়ে চলবে জীবন প্রবাহ।

নিত্যযাত্রী

শক্তিপ্রসাদ ঘোষ

হতাশার আশা নিয়ে বুক বেঁধে রাস্তায় নামি ফিরবো কি ফিরবো না জানেন অন্তরযামী তুবুও পৌছুতে হবে ঘড়ির সময় বেঁধে সংসারের দায় যে ভাই আমার কাঁধে আমরা যে ভাই নিত্যযাত্রী বাসে, ট্রেনে, ট্রামে ঠেলাঠেলি আর ঘামে আমরা যে ভাই নিত্যযাত্রী ট্রেনে, বাসে, ট্রামে।

সমাজের কারিগর

দুলাল সুর

ঘামে ভেজা দুর্গন্ধ শরীরে

নিঙরে নেওয়া তাজা রক্তের নির্যাস

দশ থেকে বার ঘণ্টা অমানুষিক খাটুনি

বিদ্ধস্ত শরীরে বিশ্রামের মেলেনা অবকাশ।

নিজরাজ্যে কাজের আকাল

রুটি রুজির স্বার্থে যেতে হয় ভিন রাজ্যে

পরিবার পরিজনদের মায়া ত্যাগ করে

দুমুঠো অন্নের নিশ্চিত ভরণপোষণ রক্ষার্থে।

চুক্তিভিত্তিক বা মাসমাইনে নয়

কাজের অনুপস্থিতিতে মিলবে না মজুরী

শারীরিক অসুস্থতা মালিকের চোখে অজুহাত

ঝাঁজরা কলজেতে ক্ষয়রোগের উপস্থিতি।

কায়িক পরিশ্রমই একমাত্র পুঁজি

‘ব’ কলমে এরাই সমাজের কারিগর

অনাদর অবহেলা নিত্য সঙ্গী পায়না যোগ্য সম্মান

পরিযায়ী শ্রমিকের তকমায় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

মৃত্যু সংবাদ

শেখ রমজান আলী

আমার দীর্ঘশ্বাসে নিভে যাক ক্লান্ত প্রদীপ

আঁধার নেমে আসুক নিঃসঙ্গ জীবনে।

একাকীত্ব মেখেছি সারা শরীর জুড়ে,

দুঃখ দিয়ে মুখ ঢাকি,কোথায় তোমার হাত।

আগে বজ্রপাতের শব্দও ভালো লাগতো

এখন হিযলবনের ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকও বড্ডো অসহ্য লাগে।

জোনাকিরা আর আসে না আমার ঘরে

একে একে সবাই মুখ ফিরিয়েছে, তোমার মতো।

যেইপথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কথা ছিল,

সেইখানে এখন নতুন বস্তি গড়ে উঠেছে।

নতুন নতুন মানুষের ভিড়ে নিজেকে বড্ড বেমানান লাগে।

বলো কোথায় দাঁড়াই?

একটা যদি সমুদ্র হতো এই শহরের বুকে

ভাসিয়ে দিতাম যত কালসিটে অনুভূতি।

বালুকা যেমন জলের বিরহে নিজেকে জ্বালায় সূর্যের তাপে

ঠিক সেভাবেই নগ্ন পায়ে হেঁটে যেতাম দীর্ঘ বালুচর।

নিজের ইচ্ছে গুলোকে খুন করেছি তোমার জন্যই

তোমার জন্যই অপরাধী, জেল খাটছি নিজের ঘরেই।

অমাবস্যার থেকেও ভয়ঙ্কর অন্ধকার আমার চার দেওয়ালের পৃথিবী

ধীরে ধীরে অন্ধকারের সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছি।

একটু একটু করে দ্যুতি হারাচ্ছে আত্মা।

চৈত্রের ঝরা পাতার শব্দে, এগিয়ে আসে মৃত্যু সংবাদ।

আমার বাবা

অসিত কুমার রায় (রক্তিম)

বাবা আমি আসছি

দেশের অবস্থা এই মুহূর্তে খুব সঙ্কটজনক

আমি ও চাই বর্তমান পরিস্থিতিতে পাশে থাকতে

তুমি ডেকেছ আমি না গিয়ে পারি

তুমিই তো আমার ঈশ্বর।

বাবা আমি আসছি

না আকাশপথে না রেলপথে

এই রাজ্য সুযোগ দিয়েছে যাবো সড়কপথে

তোমার আশীর্বাদ না থাকলে হতোনা

তুমিই তো আমার প্রথম গুরু

বাবা আমি আসছি

মায়ের যন্ত্রণা কখন বুঝতে দাওনি

মা হয়ে রাত জেগেছ, বাবা হয়ে হেঁটেছ পথ

এবারে ফেরার সময় চোখে জল দেখেছি

কী বলতে চেয়ে যেন বোল্লেনা ।

বাবা আমি আসছি

শেষ ফোনে প্রায় অস্ফুটস্বরে বলেছিলে

সময়টা বিশেষ ভালোনা, খুব সাবধানে থাকিস

তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কোন কারণে

প্রতিবেশী কেঊ বলে তুমি ভাল নেই ।

বাবা আমি আসছি

মন বলছে তুমি নিশ্চিত ভালো নেই

প্রায় আড়াই হাজার কিমি অতিক্রম করছি

যদি পাখী হতাম এখুনি উড়ে যেতাম

তোমার কাছে তোমার পাশে ।

বাবা আমি আসছি

আর একটু অপেক্ষা করবে হে ঈশ্বর

রাত ফূরালেই আমি তোমায় দেখতে পাব

জলটা বাড়িয়ে বলব আমি এসেছি

বিশ্বাসে তোমায় ছুঁয়ে দেখব ।

বাবা আমি এসে গেছি

তুমি এখনো সাদা চাদরে শুয়ে ?

খোকা এলি ! বলেতো তুমি ডাকলে না ।

তোমার শরীর হিম-শীতল কেন?

অভিমানে কী স্তব্ধ হয়ে গেলে।

বেদনার ইতিহাস

আনসারুল ইসলাম

স্বর্ণাক্ষরে লেখা রবে অসংখ্য বেদনার ইতিহাস
কুড়ি সাল মানে লাখো মানুষের লাখো সর্বনাশ
লাখো ব্যথার সহস্র পাহাড় লাখো রাস্তার মোড়ে
লাখো পায়ের রাঙ্গা রক্ত লাখো ইতিহাস গড়ে

লাখো বেদনা লেখা রবে লাখো খাতার পাতায়
লাখো ইতিহাস জমে রবে শুধু হৃদয়ের খাতায়
লাখো বেদনার মর্মর ধ্বনির কিছুটা যাবে জানা
অজস্র বেদনা অগুণিত কথা রয়ে যাবে অজানা

ছড়িয়ে রবে ব্যাথাতুর বুকে বেদনার্ত কিছু স্মৃতি
চিরনিদ্রায় শায়িত মায়ের ঘুম ভাঙ্গানোর আকুতি
ক্ষুধার্ত মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ পেটের যন্ত্রণা

অবোধ শিশুর মধুর বাণী মাকে দেওয়া শান্তনা

লাখো দুর্দশা চর্চিত হবে দোকানে-পাড়ার মোড়ে
অগুণিত বেদনা মিলিয়ে যাবে শত বেদনার ভিড়ে
রয়ে যাবে মনে রেলপথে কাটা শ্রমিকের কত লাশ
ক্ষুধার্থ শ্রমিকের খাবারের আকুতি লাঠির ইতিহাস

নিরবে সয়েছে শত বেদনা কত অকথ্য অত্যাচার
আইনের নামে অগণিত আঘাত নির্মম নির্বিচার
কত শ্রমিকের ফেটেছে মাথা আইনের লাঠির ঘায়ে
পড়েছে ফোসকা ঝরেছে রক্ত অসহায় কত পায়ে

ঝড়ের তান্ডবে ঘরছাড়া মানুষের সহস্র হাহাকার
বন-বনানী লুটিয়ে পথে অজস্র পাখি নির্বিকার
বাঁধ ভাঙ্গা নদী এনেছে প্লাবণ অপ্রত্যাশিত বর্ষা
বিপদের মাঝে এসেছে বিপদ হারিয়েছে ভরসা

নোনা জলে ডুবেছে ফসল নয়নে নেমেছে শ্রাবণ

প্রকৃতির মিলিত আঘাত বাঁচার করুন নিবেদন

অগুনিত মানুষের প্রাণ নিতে এসেছে কুড়ি় সাল

বেদনার কথা স্মৃতির পাতায় লেখা রবে চিরকাল!

উষ্ণতার গভীরতা

সহিদুল ইসলাম

শীতের গভীরতা উষ্ণতার স্কেল

মাপনীর শেষ প্রান্ত হাবুডুবু।

উষ্ণায়ন তুষার খণ্ড গলিত অক্ষর

বিলীন বধির সেতারার তার।

ব্যর্থ নামের নদীটির তীরে

আলামিন ইসলাম

কে খুঁজবে শেষ পথ?

সময়ের আচারে সেদ্ধ হয় নীল স্বপ্ন।

তাকে তফাতে থাকতে বলি।

বুঝে নাও অপার্থিব গান।

করুন সুরে কোরাণের আয়াত আওড়ে চলে নদী।

এই যে আজগুবি গুজব

মাফলারের মত জড়িয়ে নিলে কানে।

অন্ধ!

হা-হুতোশ নেই।

তুমি বাতাসের স্বরলিপি বোঝো।

অথচ শিশিরের ছায়া মেখে, অল্প কিছুক্ষণ বৃষ্টি হতে পারনি।

সুন্দর পৃথিবী

মমতাহেনা খাতুন

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে

কে চাই চলে যেতে।।

বসন্তের কোকিল এর ডাকে

বাঁচার প্রেরণা জেগে ওঠে

শত দুঃখ শত যন্ত্রনার মাঝে

জাগিয়ে তোলে তার গানের সুরে

হারিয়ে যাওয়া জীবন এর পথ ছেড়ে

খুঁজে পাওয়া নতুন জীবন এর সাথে

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে

কে চাই চলে যেতে।।

পৃথিবীতে আছে কতো সুখ কতো আনন্দ

প্রকৃতি জীবনে ভরিয়ে দিয়েছে কতো ছন্দ

এই আলো আঁধারি পথের পাড়ে

কতো না পথিক গেছে চলে

শত দুঃখ যন্ত্রণার মাঝে

জীবন খুঁজে পেয়েছে বাঁচার মানে

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে

কে চাই চলে যেতে।।

আমার একটা আকাশ আছে

হি-মু (আকাশ আহমেদ)

সীমাহীনতা ছাড়িয়ে একটি আকাশ আছে আমার

যেই আকাশের কান্নার সাথে

আমার দুঃখ ধুয়ে যায়।

যেই আকাশের হাসির মাঝে আমার সুখেরা ঘুরে বেড়ায়।

চৈত্র দিনে তীব্র ক্ষোভের উষ্ণতায়,

যেই আকাশ আমায় জীবন বাজি রেখে পুড়তে শিখিয়েছে।

দেখিয়েছে আঁধার মাঝেও আলো আছে

তারাদের মত।

তোমরাও নাকি আকাশ ভালোবাসো,

আকাশের কষ্ট দেখে তবে আড়াল কেন হও,

রাত্রি এলে তোমরা আকাশের সুখ নিয়ে শুধু পালাও।

তোমাদের তবে আকাশের চেয়েও প্রিয় অন্যকিছু!

তবে কেন মিথ্যে বলো আকাশ ভালোবাসি।

তোমাদের কোন আকাশ নেই,

আছে আকাশের মতো ছায়া ঢাকা কালো চাঁদর!

আমার একটি আকাশ আছে,

নীল রঙে যেথায় হাজার স্বপ্ন লেখা।

আমার একটি আকাশ আছে,

কালো মেঘের ভেলায়,

হাজার দুঃখ সেথায় করে খেলা।

আমার কেউ নেই!

আমার একটি আকাশ আছে,

যার কেউ থাকেনা,

তার একটি আকাশ থাকে।

এই দুনিয়ায়

আলিয়া খাতুন

এই স্বার্থের দুনিয়ায়, কেউ করোনা মন বিনিময়।

তার স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে, যাবে দূরে সরে ঠেলে।

পাবে না তার কোন পরিচয়, এই স্বার্থের দুনিয়ায়।

প্রেম করো না দেহের সনে, আত্বার সনে ছাড়া।

কলঙ্কিনী বলবে লোকে,

হবে সর্বহারা, তুমি হবে সর্বহারা। প্রেমেতে সুখ যেমন, প্রেমেতে মরন।

বাধা বিপদ আসবে প্রেমে, কারন অকারন।

তবু মন থাকে সেই প্রেমেরি আশায়, এই স্বার্থের দুনিয়ায়। গায়ের রং ফর্সা হলে, ভালোবাসি সবাই বলে।

কাল, ফর্সা গড়েছেন ওই বিধাতায়, কিছু কিছু ভালোবাসা স্মৃতি হয়ে রয়।

প্রেমের কারণে কারো কারো, জীবন দীপ নিভে যায়।

এই স্বার্থের দুনিয়ায়, কেউ করোনা মন বিনিময়।

রিয়েলিটি শো

মানস মৈত্র

একটা মালগাড়ি, ষোলজন শ্রমিকের উপর দিয়ে চলে গেল কাঁচির মতো।

স্যরি,

বাবুদের দেওয়া একটা ফ্যান্টাসির নাম আছে ওদের --পরিযায়ী শ্রমিক।

বুক থেকে দেহ ভাগ হয়ে,

পাসপোর্ট ছবির মতো পড়ে আছে

ভাঙা ভাঙা পাথরের উপর।

ছৌ য়ের মুখোশের মতো কিছু মাথা পড়ে আছে বেলাইন।

ভাসানের মতো আকাশেতে স্থির চোখ।

পড়ে আছে উপমাহীন নির্লিপ্ত নিরুদ্বেগ রুটি

তাদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে।

কাটা হাত আজ ক্লান্ত।

সে হাতে কাজ নেই।

এ কাটা হাত অকেজো দেশের

বন্ধ ফ্যাক্টারীর গেট নাড়িয়ে এসেছে কিছুক্ষণ আগে।

ঝনঝন শব্দ জেগে আছে ভাগ্য আর আয়ুরেখা ঘেঁষে।

শুধু বুকের নীচে পেট গুলো হাঁ করে আছে।

ওদের পেট ভরে না কখনও।

আধপেটা খায় ওরা।

বাকি আধপেটে লাথি।

আধপেট খালি।

এরকম খালি-তালি-লাথি-সোম দিয়ে

কোনো তাল তৈরী হলে,

আমি তার নাম দেবো--- শ্রমিক তাল।

মৃতদের পরিবার কত টাকা পাবে?

আমি রাখিনি হিসেব।

ওরা মানুষ ছিল?

---না।

শ্রমিক হবে হয়তো।

---হয়তো।

ওরা কজন ছিল? ষোল না সতেরো?

----কিছু একটা হবে।

আদৌ জীবত ছিল কোনদিন কি ওরা ?

এখন যে জড়ো করা আছে দেহ !

ওরা জীব না জড়?

অথবা দুয়ের মঝিঝম্ পর্যায়?

ওরা জানতো না,

শ্রমিক সংগঠনের তাবড় নেতা,

বিনোদনের তামাম সানগ্লাস অভিনেতানেত্রী,

পরিবহন-সড়ক-রেলমন্ত্রীদের অযৌক্তিক উবাচ,

একদিন সবাইকে ছাপিয়ে

ওরাও ভাইরাল হয়ে যাবে মানুষ,মিডিয়ার স্যানিটাইজড্ হাতে।

বিদায় বসন্ত

জাহিদুল ইসলাম

দিকদিগন্তের মৃদু বাতাস মুমূর্ষ প্রায় আজ,

নিস্তব্ধতার কারাপ্রাচীরে পুরাতন তার সাজ।।

কোকিল যেন ক্লান্ত হয়েছে ডাকেনা সখিরে,

শিমুল গাছের লাল রং আজি গেছে সব ঝরে।।

এতদিন যে প্রান্তর দুলছিলো মায়া সবুজে ,

হরিল সেই সীতা রাবন রূপী কৃষক অবুঝে।।

হেথা হোথা ছড়িয়ে রেখেছে শস্যসোনালী ,

যেমন জানকি ছড়িয়েছে তার চুড়ি-কর্ণ বালী।।

সেই বাঁকা চাঁদ আজ উঠেছে সাধের দিগন্তে,

ধূসর আকাশের সংকেত বার্তা বিদায়ী বসন্তে।।

একা ওই মাঠে কলমির ফুল শুন্য পানে চায়,

পাচ্ছে কেহ যদি পায়ে মাড়িয়ে ছিন্ন করবে হায়।।

ঈশান কোণে ওই ঘন কালো জলদ উঁকি দেয়,

এখন বুঝি কালবৈশাখী নাসিবে যত গ্লানি ভয়।।

নূতন শশী মরানদী একান্তে ফিসফিসিয়ে কয়,

আর যাক সব আমি তুমি রহিব রিক্ত নিরালায়।।

দেখা নাহি আর শ্যামলা দোহরা কৃষকের ঝির

যে আসিত রোজ গানগাহিত ফসলে দিত নীর।।

ফিসফিস সুরে দোয়িত-দোয়িতার খেলা আজ কই

কাঠফাটা রোদে হারিয়ে গেছে বিবাগী হয়েছে সোই।।

এই মৃত্যু উপত্যকা আমারই দেশ

সাব্বির আহম্মেদ (অপু)

সান্ধ্যকালীন বাতাসে বোমার গন্ধ আর সহস্র লাশের ভিড়ে হটাৎ রাত নেমে আসে। আমি রাত্রির শরীরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম একটি সকালের অপেক্ষায়। সকাল আসেনি, বরং অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ছায়াপথকে ছুঁয়েছে।

আমি দৃপ্তকণ্ঠে স্লোগান তুলেছিলাম,

"বন্দে মাতরম্"; ওরা 'মা'কে তালাবন্দী করে

শ্লোগানটা নিয়ে পালিয়ে গেছে, আর—

আমাকে করেছে রক্তাক্ত।

আমি 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলে চেঁচিয়ে ছিলাম।

চারি দিকে বহু মানুষের ভিড়, সবাই কাজ চায়, অধিকার চায়।

হঠাৎ বিপরীতে ভেসে আসে 'এদেশ কেবল আমাদেরই, ঘুসপেটিয়া বাহার যাও'।

তখনই ক্ষুধার্ত উলঙ্গ মানুষের ঘুমের মাঝে আমি একা।

তবুও ভোরের অপেক্ষায় আমি দাঁড়িয়ে,

চারি দিকে ফিস ফিস করে কেউ কেউ বলে ভোর আসবেই;

ঠিক তখনই কে যেন বলে গেল ওরা তো মৃত্যু উপত্যকায় শুয়ে।

আমি একদম নড়াচড়া না করেই জানাই আমিও মৃত, অন্য সবার মতো। তবু ওদের বিচার হবে,

এ হত্যার বিচার হবে - এই মৃত্যু উপত্যকায়।

জালিম

সফিউদ্দিন বিশ্বাস

মাথার লম্বিত কালো চুলে ঢাকা ছিনা বরাবর

উস্কোখুস্কো-তাতে শুধু উকুনের অত্যাচার।

দাড়ি হীন মস্ত গোঁফে গাল ত্বক জোড়া

অপরে ভর করে চলে,ভাবিও না খোঁড়া।

ভালো চিন্তায় শুধু বাঁধ সাধে

পরিবেশ কম্পিত বেসুরো নিনাদে।

নিত্য আফিম খাওয়ার অফিসে বসে

হাজির,নেতা চ্যালা চামুন্ড কত আর;

নিজেরা ভাবেনা কভু, ন্যায় ও সত্যের কাছে

জীবন চালাতে হয়েছে কত কত ধার।

বিছায়ে আসন তিক্ত লবনাক্ত সাগরে

ছটো বড়ো গোদা নেতা হাজির আসরে;

চুলের ঝাপটে উকুন ঝরে ঝরে পড়ে

যত দুষ্ট ফন্দি কিলবিল করে নড়ে।।

দি বাইকার

মহঃ সুবল হোসেন

তুমি বাইক চালাও

নাকি হাওয়ায় জাহাজ!

যে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে!

কি ভেবে তোমার হাতের এক্সিলারেটর ঘরে?

যেদ করে, বায়না ধরে, দুদিন না খায়ে,

বাবাকে দিয়ে বাইক কেনা লে?

বলছি এতোই ইচ্ছে ছিল ফাসতে মরন জালে!

তোমার কি মনে থাকে না

মা পথ চেয়ে বসে থাকে

তুমি মরলে মা খোকা বলে ডাকবে কাকে?

কাকে দেখাও গো ওই ওড়ন?

আচ্ছা মেয়েরা খুশি হয়!

কে বলল?

কখনো দাড়িয়ে শুনেছো কি তাদের মুখের বচন!

ঘৃণা ছাড়া তা কিছুই নয়!

এক সেকেন্ডে যখন বৃদ্ধকে করো ক্রস।

সে মরতে মরতে বাঁচে।

কীভাবো সে আশির্বাদ করে?

উজাড় করে অভিশাপ দেয়

যেন তুমি যাও প্রাণে মরে।

তোমার গাড়ি, তোমার সময়

আসতে আসতে চালাও না গো।

দেখুক সবাই।

সময় হলে ফিরে আসবে

মায়ের কাছে।

এটাই তো মা চাই।

মায়াহীন লীলাখেলা

পলাশ শেইখ

দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ সৌরকিরন

একচিলতে কৃষ্ণাভ মেঘের আবরনে,

অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারিক্কি পরিবেশ

ব্যর্থ প্রেমিকের নগ্ন হৃদয়ের প্রতিফলন গগনে।

রবীন্দ্রসংগীতের তালে ভাসান মধ্যবিত্ত চিত্ত

রোমাঞ্চকর ফোনালাপ যৌবনপূর্ণ শরীরের

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির স্বাদ আস্বাদন

কিংবা হেডফোনে যুবকের রকগান উপভোগ

সমস্ত বিলাসিতায় বর্ণহীন

পাকা ফসল ক্ষয়ক্ষতির ব্যর্থ

ভীতি নিবারনের চেষ্টা

ঝোড়ো হাওয়ায় শিহরিত বালক

গম্ভীরতার স্থান অবুঝ বালকের নেত্রে

গাছের দুলুনিতে বা বজ্রের গর্জনে।

সকল বিলাসিতাই প্রাণ হারায়

স্রষ্টার মায়াহীন ধ্বংসাত্বক লীলাখেলায়

টিউটর

শিউলি খাতুন

জীবনতরীর ঘুর্ণিপাকে ঘুরছি অবিরত,

ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণনে আজ উড়ছে ধুলো যত।

লকডাউনে বন্ধ টিউশন, বন্ধ উপার্জন,

কে রাখে কার খোঁজ? ক্যামনে হয় দিনযাপন?

ভালো ভাব ভালো কথা আসেনা তো লেখায়,

বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে উপোস থাকতে হয়।

টিউশন এদের ধ্যান-জ্ঞান, টিউশন এদের পেশা, এর মাধ্যমে ছাত্রদের দিয়ে থাকে নবদিশা।

এদেরও বসন্ত ছিল, আবার কেউ করেছে পার;

অদৃশ্য শক্তির অভিসম্পাতে আজ তারা টিউটর।

এরাও সমাজবন্ধু, সমাজ গড়ার কারিগর

সকলের সাথে এদেরও দাও বাঁচার অধিকার।

আইনের অঙ্গনে

অনুপম গিরি

ন্যায় ত্যাগের দীপ্ত কেতন উড়ছে আজও ঊর্ধ্বে,

নিম্নে তবু রক্ত ঝরে সন্ত্রাসেরই যুদ্ধে।

দুর্নীতির ওই বেড়াজালে ন্যায় শুধুই ক্ষিপ্ত,

স্বাধীনতার কাঠগড়াতে, শুধু স্বাধীনচেতাই রিক্ত।

বিচার সভায় আছেন মালিক, দোষী বন্দি কারাগারে,

বিচার শুধুই যায় না পাওয়া, অনাচারের ভারে।

অন্যায়েরই সূর্যদয়ে হাপুস-হুপুস বেলায়,

দন্ড সভা মেতেছে কেমন ন্যায় বিঘ্ন খেলায়।

ঘুরিয়া দেখো দেখিবে তুমি, অন্যায়েরই লেলিহান,

কিছু কি করিতে পারিবে, তোমার লিখিত বজ্রবান?

দোষীর দোষে বাড়িছে কত রত্নগর্ভের হাহাকার,

ধর্ষিতা নারীর রিপোর্টে শুধুই সময়ের সমাহার।

দোষী যারা ঘুরে বেড়ায় সমাজ জনের মাঝে,

জ্ঞানগর্ভ পুলিশ তবু অন্ধ বোবা সাজে।

রাজার নীতির রাজ্যে আজ ন্যায় শুধুই লুপ্ত,

আইন সভায় সাক্ষী তাই অনাচারে যুক্ত।

সইতো যারা ফুটপাতে, অভুক্ত, মৃত্যু যাহার সনে,

তবু রক্ত চোষে অর্থলোভী আইনের ওই অঙ্গনে।

অর্থ যদি রক্ত হত, চামড়া যদি মান,

প্রাণের সভায় খুঁজতে হতো এই পৃথিবীর জান।

রিক্ত আশায় চোখের পাতায় স্বপ্ন শুধুই চরে,

ক্ষিপ্ত আকুতি গুমড়ে মরে, ন্যায় বিচারের তরে।

তবু সততার প্রতীক তুমি, অসতের ক্ষনে,

তাই আশাতে বাঁধিয়া বুক, আসি আইনের এই অঙ্গণে।

বৃক্ষ কথা

সামুন ফরিদ

তোমার পাতায় জীবন ধারণ তোমার ছায়ায় বাস,

তোমার ত্যাগের দীর্ঘশ্বাসে আমাদের প্রশ্বাস -

তোমার ফুলের সুগন্ধ তে আমরা মাতোয়ারা

মিষ্টি ফলের আস্বাদেতে হয় যে পাগল পারা,

জন্ম থেকে ধরার সেবায় ঢেলে দিয়ে প্রাণ

প্রাণবায়ুকে আগলে রাখ বাঁচাতে তার মান।

পাতায় পাতায় সুর মিলিয়ে গান যে তুমি ধরো

সেই গানেতে পাখ-পাখিলির মনটি সদা হর

তাইতো ওরা তোমার সাথে মিতালীর টানে -

তোমার কোলে বাসা বাঁধে হরষিত প্রাণে।

যুগ যুগান্তের যাত্রী তুমি কঠিন তোমার পথ

ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা -ক্ষরায় সাহসী বিজয় রথ

তবু তোমার নিধনেতে নির্দয় অবলীলায় -

একবারও কি ভাবছি মোরা মারছি কুঠার গলায়?

দৌড়ে চলো

উমর ফারুক

ওরা নিয়ম করে চলে

তবু বিশ্ব আঁধার নামে

ওরা কোটি কোটি পাপী

তোকে সত্য দিয়ে মাপি।

দৌড়ে চলো সময় হলো

বিড়াল গুলোর অগ্নি চোখ

কোকিল এলো গান শোনালো

মুখ ঢেকে চল বাঁধোরে জোট

পশ্চিমার দৌড় দিলাম

প্রগতির ঝড় ওঠেছে

নদীর মতো জোর কদমে

এ প্রাতে বিপ্লব ডেকেছে।

মরন পাখি আসার আগে

একূল ভেঙে ওকূল জাগে।

দৌড়ে চলো দিন নেই আর

আসর জমে রঙের বাহার।

ওরা কারা?

ওয়াসিম রেজা

ঘোর কুৎসিত অমানিশা ঘিরে ফেলছে ক্রমেই

দমের চাকাও আজ নিস্তব্ধ, নিস্তেজ।

এক চাপা বুক ফাটা আর্তনাদ...

মানব গোঙানির অস্ফুট বানী ধেয়ে আসছে,

বিঁধছে বুকে তীরের ফলার মত।

নির্মম উৎপীড়নের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত জীবন রসটুকুও আজ শুকিয়ে যাওয়া লাল গোলাপটির মত মূল্যহীন, অকেজো, অপাংতেয়!

সব-সব-সব ! হ্যাঁ, এ সবই তো ভক্তবৃন্দের অন্ধভক্তির উলঙ্গ আস্ফালনের ফল।

যারা লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন পথভোলা পঙ্গপাল

যারা ছড়িয়ে দিচ্ছে বিদ্বেষের বিষবাষ্প জলে স্থলে অন্তরীক্ষে।

ওরা কারা?

ওরা নীচ, ওরা বর্বর, ওরা বন্য,

ওরা রক্ত চোষা ভ্যাম্পায়ার !

আবার বহুমত বলে ওরা নাকি 'গেরুয়া'র দল !

কলঙ্ক

শিরিন আকতার মন্ডল

পৃথিবী অনেক সুন্দরকতকী আছে দেখবার,

তারই মাঝে সমাজের কলঙ্ক মুখ,,

ফুটে উঠেছে বার বার।।

বন্ধ নয়নে ফুটে উঠেছে কত ধর্ষিতার নাম,

খোলা চেতনেও শান্তি পাইনা

সমাজের কলঙ্ক শয়তান।।

কত কত সব পুলিশ বাহিনী,CCTV র ঘটা ঘটি,,

তবুও কেনো সুরক্ষিত নয়

রাতে বাড়ি ফেরা একলা মেয়েটি?

নারী হত্যা,নারী নির্যাতন,বধু নির্যাতন ও ধর্ষণ,

পণপ্রথার বোঝা কেনো বয়ে যায় সমস্ত মেয়েরা সারাজীবন?

ক্লান্ত আজ লিখতে লিখতে লক্ষ কোটি লেখক ,,

সমাজ,মানতে শেখ ছেলে-মেয়ে সমান,,

দুজনেই একে অপরের পরিপূরক।।

হাতুড়ির ঘাঁ

কিরন সেখ

হাতুড়ির ঘায়ে পাথর চূর্ণ

শব্দে মাতাল শ্রমিকের দল,

শাষন,শোষণে রক্ত পাষাণ।

সেই অসংগঠিত,সাধারনরাই

দুষ্ট প্রভাবের অভিপ্রায়ে,

খাদ্য জোগাতে হিমশিম খায়।

তোমার শাসন,তোমার দ্বারাই

গণতন্ত্রের এটাই বালাই,

কেন তবে নয় তোমার জন্য

ভোট কেন্দ্রিক রাজনীতি শূন্য?

ধনকুবেরর ওই কোষাগার

পূর্ণতা পায় শ্রমের দ্বারাই,

অসময়ে তবে,কেন না হবে

সমবণ্টন,সম আচরণ?

শোষণ ছিল এলিট সমাজে

সেটাও এখন আস্তিত্বমান,

পন্থা শুধু পরিবর্তন

বদলায়নি গুণগত মান।

হাতুড়ির ঘায়ে সব কিছু ভাঙ্গে

ভাঙা যা অসম্ভব,

লড়ে যায় আজও অসম লড়াই

জন হেনরির ন্যায় সব।

নিঃস্বার্থ মানবতা

সামিম বাদশা সেখ

কী করিয়াছ তাহাদিগের লাগিয়া

জাগাইয়া দেখ আপনারে,

উঁকি মারিয়া দেখো,

আপন মনের কিনারে,

পাইলেও পাইতে পারো জবাব ।

ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া দেখো তো,

রাজপথ লাগোয়া ফুটপাত পানে,

ভুগিতেছে অসহায়তার জ্বরে ।

হুমড়ি দিয়া পড়িছে ডাস্টবিনে

জাতির ভবিষ্যত্ ।

খুঁটিয়া খাইতেছে,

সভ্য সমাজের উচ্ছিষ্ট,

কিছু ভালো, কিছু

সভ্য পদে পদপিষ্ট ।

স্বাস্থ্য কারে কয়, সে কী তাহা জানে।

খাবার লইয়া সারমেয়র সহিত

করিয়া চলে লড়াই,

এক পক্ষ পায়,

অপর পক্ষ জ্বলিয়া মরে ক্ষুধায়।

চাহিয়া দেখো তো,

তোমার উন্নত শহরের পার্শ্বে বেড়ে ওঠা

অনুন্নত নোংরা বস্তি টারে।

কখনো কী ভ্রম বশতও

জানিতে চাহিয়াছ?

কেমনতর তাহাদের জীবনযাত্রা,

কিরূপ তাহাদিগের দারিদ্র্যতার মাত্রা।

অনাহারে ভুগিয়া মরিতেছে, নিষ্পাপ সদ্যজাত

দারিদ্র্যতারকাছে,

তাহারা নত কুপোকাত ।

কাহারও দৃষ্টি পড়ে না,

তাহাদের পানে

সভ্য সমাজ স্বার্থান্বেষী,

ছুটিয়া চলে আপন স্বার্থের টানে ।

সমাজ আশক্ত, সভ্যেরা মাতাল

আপন স্বার্থের নেশায়,

মানবতা দ্বারে অপেক্ষারত,

সভ্য সমাজের ঘোর ফিরিবার আশায় ।

একদিন ঘোর ফিরিবে

খুলিয়া পড়িবে স্বার্থের ঠুলি,

কন্ঠ হইতে ধ্বনিত হইবে

নিঃস্বার্থ মানবতার বুলি।

ফুটপাত কিংবা বস্তির কেহ

আর ভুগিবেনা অনাহারে,

সবেমিলে একত্রে

অন্নের জোগান দিব তাহারে।

লঙ্ঘিত হইবে স্বার্থের কাঁটাতার

দারিদ্র্যতার ঘটিবে ক্ষয়,

বাতাসে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা

হৃদয়ে মানবতার জয় ।

অসুস্থ পৃথিবী

মুস্ফাজুল ইসলাম

আরেকটু গেলে অতিক্রম করব মৃত্যুপথ

নদী ডিঙিয়ে তেড়ে আসছে ফেরেশতা

পৃথিবীর রক্ত শিরায় মিশেছে বিষাক্ত ছোবল,

ক্ষুধার্ত রোগ,অসুস্থ পৃথিবী

আমরা শুঁকে যাচ্ছি আতঙ্কের গন্ধ

আর হিসেবের খাতায় রেখে দিচ্ছি ঘুড়ি কাটার দেহ

মৃত পরিচয়।

এখনো বিবেকের জানলা খুলে দেখা হলোনা বিশ্ব উঠোন,

গা থেকে ঝেড়ে উঠতে পারেনি গুনাহ

শূন্য আকাশ থেকে ভেসে আসছে মৃত ব্যক্তির আহ্বান

এক এক করে মরে যাচ্ছে বুকে পুষে রাখা স্বপ্ন

খুলে ফেলেছি মায়া লতার বাঁধন

সমাজের শ্রেণীভেদে মোমবাতি

সুজাতা মুখার্জী

বৃষ্টির জন্য লোডশেডিং সঙ্গে গাঢ় অন্ধকার,

সন্ধ্যের মসলামুড়ি আর গোলটেবিলে পরিবার।

টেবিলের মাঝখানে একটাই মাত্র মোমবাতি,

দমকা হাওয়া থেকে শিখা বাঁচাতে জানাচ্ছে বাঁচাতে জানাচ্ছে আকুতি।

যুঝছে সে ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি আর শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠানামার বৃষ্টি আর শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠানামার ওঠানামার সাথে,

নিজেকে শেষ করে সবটুকু আলো দিতে চায় বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যাকে।

শেষ নীলচে আভাটুকুও যেন দিয়ে যেতে চায় আমাকে,

কানা ভাঙ্গা আধারটিও বিদ্রুপে ঢাকে।

জল চুঁইয়ে পড়া চালের নিচে জমাটবাঁধা

অন্ধকার,

আলো জ্বালানোর দামটুকুও হয়তো নেই কারোর কাছে আর।

ঘরে ঘরে বেকারত্ব ; কচি সন্তানের খিদের কান্না,

বোবা পাষাণও আজ খাবার চাইছে , আগুন নেই কিভাবে হবে রান্না?

খুশির ইটের গাঁথনিগুলো আজ যে বড়ই দুর্বল,

পয়সা নেই চাল বাড়ন্ত যান্ত্রিকতা বিকল ।

ভাবছে কাল সকালে যাবেই পাশের বাড়িতে,

চেয়ে আনবে গলে পরা মোম সঙ্গে মোমবাতির শিখাকে।

সেই জমাট বাঁধা অন্ধকারে কিছু প্রাণ আজও অপেক্ষায় আছে,

কবে বসবে তাদের সান্ধ্যআসর একটা মোমবাতির আলোর নিচে।

ইট পাথরের নির্দয়তা সরে সবুজ আসবে প্রাণে, ফিরতে আমাদের হবেই ছেঁড়া শিকড়ের টানে।।

অসুখ

রাজু মন্ডল

এসব অসুখ আমার নয়

আর কার ছিল জানিনা

প্রকারভেদ করে যে প্রেসক্রিপশন ফুঁড়ে ওঠে

তার ঔষধ যেভাবে ঈশ্বর হয়

সেই তো প্রকৃত বিশ্বাসের আরোগ্য ফল

তবুও অসুখের মত কিভাবে যে প্রেসক্রিপশন বদলে যায় বারবার, বুঝিনা

যেন পূর্বেই লেখা ছিল এসব সারকথা

তবু কিভাবে যে বাঁচতে হয় গোঁ গোঁ করে বিছানায়

তার বিশ্লেষণ ঘাম জানে

আর কত রকমের অসুখ পুষে রাখি আমরা ভিতরে ভিতরে

যার ক্ষয় হয় না কোনদিন

বন্ধ করো

বদরুদ্দোজা শেখু

রুজির দায়ে লড়তে এলাম, আদর্শ আর অভাবে
রপ্ত হলাম নগর-সভায় দাঁড়াতে;
লোভের লতা বাড়লো মনে চতুর্দিকের প্রভাবে,
পারিনি তবু মনের সত্য হারাতে।

নজর হলো নিত্য নাপাক, পুড়লো আদিম বাসনা
বে-আব্রুয়ান নারী-দেহের নিবিড়ে,
রক্তাক্ত বিবেক-পাখির জাগলো বাঁচার আশও না
বস্তি-বিরাণ সজ্জাহীনের শিবিরে।

মর্ম-ফলায় দাগ কেটেছে গরীব ঝি এক শহরী
ফুটপাতে সে দিচ্ছিল জ্বাল হাঁড়িতে
তুচ্ছ -বাসে লজ্জা পেলেও লজ্জা ঢাকার প্রহরী

ছিল না তার স্বল্প-বহর শাড়িতে।

রূপ-চর্চার সাজসজ্জার আড়াল উগ্র জৌলসে

নারীত্বের নি-লজ্জা যায় না এড়ানো;

বন্ধ করো রূপের নিলাম--- আধুনিকতার খোলসে

কামিজ খুলে', কাঁচুলি প'রে বেড়ানো।।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার...

লকডাউনের প্রথম দিক থেকেই দুঃস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চিন্তা ভাবনা থেকেই আমাদের এই প্রয়াসের পরিকল্পনা গঠিত হয়,মানুষকে সাহায্য করার অঙ্গীকার থেকেই আমাদের এই অনলাইন পত্রিকা প্রকাশিত করা হলো।আমাদের যারা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন ভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।আপনাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমাদের চলার পথ সুগম করুক...

ধন্যবাদান্তে,

আসাদুল্লা আল গালিব এবং পারভেজ আহমেদ

ধনিরামপুর,জলঙ্গি, মুর্শিদাবাদ